প্রবন্ধ

বিশ্বপরিচয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

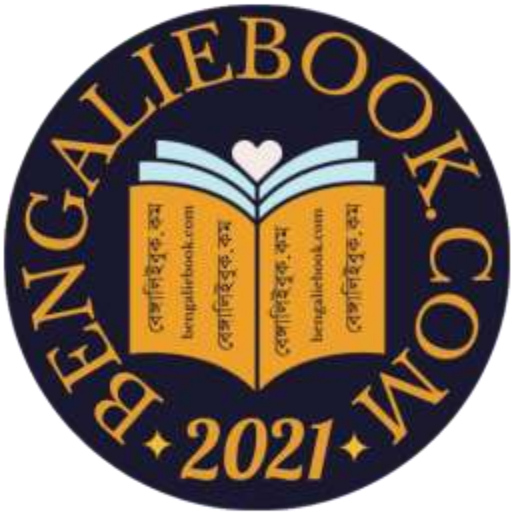
BENGALIEBOOK.COM
বেঙ্গলিইবুক.কম
bengaliebook.com
2021

সূচিপত্র

- উৎসর্গ 2
- পরমাণুলোক 8
- নক্ষত্রলোক 35
- সৌরজগৎ 52
- গ্রহলোক 59
- ভূলোক 74
- উপসংহার 85

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু
প্রীতিভাজনেষু

এই বইখানি তোমার নামের সঙ্গে যুক্ত করছি। বলা বাহুল্য, এর মধ্যে এমন বিজ্ঞানসম্পদ নেই যা বিনা সংকোচে তোমার হাতে দেবার যোগ্য। তা ছাড়া, অনধিকারপ্রবেশে ভুলের আশঙ্কা করে লজ্জা বোধ করছি, হয়তো তোমার সম্মান রক্ষা করাই হল না। কয়েকটি প্রামাণ্য গ্রন্থ সামনে রেখে সাধ্যমতো নিড়ানি চালিয়েছি। কিছু ওপড়ানো হল। যাই হোক আমার দুঃসাহসের দৃষ্টান্তে যদি কোনো মনীষী, যিনি একাধারে সাহিত্যরসিক ও বিজ্ঞানী, এই অত্যাবশ্যক কর্তব্যকর্মে নামেন তা হলে আমার এই চেষ্টা চরিতার্থ হবে।

শিক্ষা যারা আরম্ভ করেছে, গোড়া থেকেই বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে না হোক, বিজ্ঞানের আঙিনায় তাদের প্রবেশ করা অত্যাবশ্যক। এই জায়গায় বিজ্ঞানের সেই প্রথমপরিচয় ঘটিয়ে দেবার কাজে সাহিত্যের সহায়তা স্বীকার করলে তাতে অগৌরব নেই। সেই দায়িত্ব নিয়েই আমি এ কাজ শুরু করেছি। কিন্তু এর জবাবদিহি একা কেবল সাহিত্যের কাছেই নয়, বিজ্ঞানের কাছেও বটে। তথ্যের যাথার্থ্যে এবং সেটাকে প্রকাশ করবার যাথাযথ্যে বিজ্ঞান অল্পমাত্রও স্খলন ক্ষমা করে না। অল্প সাধ্যসত্ত্বেও যথাসম্ভব সতর্ক হয়েছি। বস্তুত আমি কর্তব্যবোধে লিখেছি কিন্তু কর্তব্য কেবল ছাত্রের প্রতি নয় আমার নিজের প্রতিও। এই লেখার ভিতর দিয়ে আমার নিজেকেও শিক্ষা দিয়ে চলতে হয়েছে। এই ছাত্রমনোভাবের সাধনা হয়তো ছাত্রদের শিক্ষাসাধনার পক্ষে উপযোগী হতেও পারে।

আমার কৈফিয়তটা তোমার কাছে একটু বড়ো করেই বলতে হচ্ছে, তা হলেই এই লেখাটি সম্বন্ধে আমার মনস্তত্ত্ব তোমার কাছে স্পষ্ট হতে পারবে।

বিশ্বজগৎ আপন অতিছোটোকে ঢাকা দিয়ে রাখল, অতিবড়োকে ছোটো করে দিল, কিংবা নেপথ্যে সরিয়ে ফেলল। মানুষের সহজ শক্তির কাঠামোর মধ্যে ধরতে পারে

নিজের চেহারাটাকে এমনি করে সাজিয়ে আমাদের কাছে ধরল। কিন্তু মানুষ আর যাই হোক সহজ মানুষ নয়। মানুষ একমাত্র জীব যে আপনার সহজ বোধকেই সন্দেহ করেছে, প্রতিবাদ করেছে, হার মানাতে পারলেই খুশি হয়েছে। মানুষ সহজশক্তির সীমানা ছাড়াবার সাধনায় দূরকে করেছে নিকট, অদৃশ্যকে করেছে প্রত্যক্ষ দুর্বোধকে দিয়েছে ভাষা। প্রকাশলোকের অন্তরে আছে যে অপ্রকাশলোক, মানুষ সেই গহনে প্রবেশ করে বিশ্বব্যাপারের মূলরহস্য কেবলই অবারিত করছে। যে সাধনায় এটা সম্ভব হয়েছে তার সুযোগ ও শক্তি পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষেরই নেই। অথচ যারা এই সাধনার শক্তি ও দান থেকে একেবারেই বঞ্চিত হল তারা আধুনিক যুগের প্রত্যন্তদেশে একঘরে হয়ে রইল।

বড়ো অরণ্যে গাছতলায় শুকনো পাতা আপনি খসে পড়ে, তাতেই মাটিকে করে উর্বরা। বিজ্ঞানচর্চার দেশে জ্ঞানের টুকরো জিনিসগুলি কেবলই ঝরে ঝরে ছড়িয়ে পড়ছে। তাতে চিত্তভূমিতে বৈজ্ঞানিক উর্বরতার জীবধর্ম জেগে উঠতে থাকে। তারই অভাবে আমাদের মন আছে অবৈজ্ঞানিক হয়ে। এই দৈন্য কেবল বিদ্যার বিভাগে নয়, কাজের ক্ষেত্রে আমাদের অকৃতার্থ করে রাখছে।

আমাদের মতো আনাড়ি এই অভাব অল্পমাত্র দূর করবার চেষ্টাতেও প্রবৃত্ত হলে তারাই সব চেয়ে কৌতুক বোধ করবে যারা আমারই মতো আনাড়ির দলে। কিন্তু আমার তরফে সামান্য কিছু বলবার আছে। শিশুর প্রতি মায়ের ঔৎসুক্য আছে কিন্তু ডাক্তারের মতো তার বিদ্যা নেই। বিদ্যাটি সে ধার করে নিতে পারে কিন্তু ঔৎসুক্য ধার করা চলে না। এই ঔৎসুক্য শুশ্রূষায় যে-রস জোগায় সেটা অবহেলা করবার জিনিস নয়।

আমি বিজ্ঞানের সাধক নই সে কথা বলা বাহুল্য। কিন্তু বালককাল থেকে বিজ্ঞানের রস আস্বাদনে আমার লোভের অন্ত ছিল না। আমার বয়স বোধ করি তখন নয়-দশ বছর; মাঝে মাঝে রবিবারে হঠাৎ আসতেন সীতানাথ দত্ত [ঘোষ] মহাশয়। আজ জানি তাঁর পুঁজি বেশি ছিল না, কিন্তু বিজ্ঞানের অতি সাধারণ দুই-একটি তত্ত্ব যখন দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিতেন আমার মন বিস্ফারিত হয়ে যেত। মনে আছে আগুনে বসালে তলার জল গরমে হালকা হয়ে উপরে ওঠে আর উপরের ঠাণ্ডা ভারী জল নীচে নামতে থাকে, জল

গরম হওয়ার এই কারণটা যখন তিনি কাঠের গুঁড়োর যোগে স্পষ্ট করে দিলেন, তখন অনবচ্ছিন্ন জলে একই কালে যে উপরে নীচে নিরন্তর ভেদ ঘটতে পারে তারই বিস্ময়ের স্মৃতি আজও মনে আছে। যে ঘটনাকে স্বতই সহজ বলে বিনা চিন্তায় ধরে নিয়েছিলুম সেটা নয় এই কথাটা বোধ হয় সেই প্রথম আমার মনকে ভাবিয়ে তুলেছিল। তার পরে বয়স তখন হয়তো বারো হবে (কেউ কেউ যেমন রঙ-কানা থাকে আমি তেমনি তারিখ-কানা এই কথাটি বলে রাখা ভালো) পিতৃদেবের সঙ্গে গিয়েছিলুম ড্যালহৌসি পাহাড়ে। সমস্ত দিন ঝাঁপানে করে গিয়ে সন্ধ্যাবেলায় পৌঁছতুম ডাকবাংলায়। তিনি চৌকি আনিয়ে আঙিনায় বসতেন। দেখতে দেখতে, গিরিশৃঙ্গের বেড়া-দেওয়া নিবিড় নীল আকাশের স্বচ্ছ অন্ধকারে তারাগুলি যেন কাছে নেমে আসত। তিনি আমাকে নক্ষত্র চিনিয়ে দিতেন, গ্রহ চিনিয়ে দিতেন। শুধু চিনিয়ে দেওয়া নয়, সূর্য থেকে তাদের কক্ষচক্রের দূরত্বমাত্রা, প্রদক্ষিণের সময় এবং অন্যান্য বিবরণ আমাকে শুনিয়ে যেতেন। তিনি যা বলে যেতেন তাই মনে করে তখনকার কাঁচা হাতে আমি একটা বড়ো প্রবন্ধ লিখেছি। স্বাদ পেয়েছিলুম বলেই লিখেছিলুম, জীবনে এই আমার প্রথম ধারাবাহিক রচনা, আর সেটা বৈজ্ঞানিক সংবাদ নিয়ে।

তার পরে বয়স আরো বেড়ে উঠল। ইংরেজি ভাষা অনেকখানি আন্দাজে বোঝবার মতো বুদ্ধি তখন আমার খুলেছে। সহজবোধ্য জ্যোতির্বিজ্ঞানের বই যেখানে যত পেয়েছি পড়তে ছাড়ি নি। মাঝে মাঝে গাণিতিক দুর্গমতায় পথ বন্ধুর হয়ে উঠেছে, তার কৃচ্ছ্রতার উপর দিয়ে মনটাকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছি। তার থেকে একটা এই শিক্ষা লাভ করেছি যে, জীবনে প্রথম অভিজ্ঞতার পথে সবই যে আমরা বুঝি তাও নয় আর সবই সুস্পষ্ট না বুঝলে আমাদের পথ এগোয় না এ কথাও বলা চলে না। জলস্থল-বিভাগের মতোই আমরা যা বুঝি তার চেয়ে না বুঝি অনেক বেশি, তবুও চলে যাচ্ছে এবং আনন্দ পাচ্ছি। কতক পরিমাণে না-বোঝাটাও আমাদের এগোবার দিকে ঠেলে দেয়। যখন ক্লাসে পড়াতুম এই কথাটা আমার মনে ছিল। আমি অনেক সময়েই বড়োবয়সের পাঠ্যসাহিত্য ছেলেবয়সের ছাত্রদের কাছে ধরেছি। কতটা বুঝেছে তার সম্পূর্ণ হিসাব নিই নি, হিসাবের বাইরেও তারা একরকম করে অনেকখানি বোঝে যা মোটে অপথ্য নয়। এই বোধটা পরীক্ষকের

পেনসিলমার্কার অধিকারগম্য নয় কিন্তু এর যথেষ্ট মূল্য আছে। অন্তত আমার জীবনে এইরকম পড়ে-পাওয়া জিনিস বাদ দিলে অনেকখানিই বাদ পড়বে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের সহজ বই পড়তে লেগে গেলুম। এই বিষয়ের বই তখন কম বের হয় নি। স্যার রবর্ট বল-এর বড়ো বইটা আমাকে অত্যন্ত আনন্দ দিয়েছে। এই আনন্দের অনুসরণ করবার আকাঙ্ক্ষায় নিউকোম্ব্স, ফ্লামরিয়ঁ প্রভৃতি অনেক লেখকের অনেক বই পড়ে গেছি – গলাধঃকরণ করেছি শাঁসসুদ্ধ বীজসুদ্ধ। তার পরে এক সময়ে সাহস করে ধরেছিলুম প্রাণতত্ত্ব সম্বন্ধে হক্সলির এক সেট প্রবন্ধমালা। জ্যোতির্বিজ্ঞান আর প্রাণবিজ্ঞান কেবলই এই দুটি বিষয় নিয়ে আমার মন নাড়াচাড়া করেছে। তাকে পাকা শিক্ষা বলে না, অর্থাৎ তাতে পাণ্ডিত্যের শক্ত গাঁথুনি নেই। কিন্তু ক্রমাগত পড়তে পড়তে মনের মধ্যে বৈজ্ঞানিক একটা মেজাজ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। অন্ধবিশ্বাসের মূঢ়তার প্রতি অশ্রদ্ধা আমাকে বুদ্ধির উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে আশা করি অনেক পরিমাণে রক্ষা করেছে। অথচ কবিত্বের এলাকায় কল্পনার মহলে বিশেষ যে লোকসান ঘটিয়েছে সে তো অনুভব করি নে।

আজ বয়সের শেষপর্বে মন অভিভূত নব্যপ্রাকৃততত্ত্বে – বৈজ্ঞানিক মায়াবাদে। তখন যা পড়েছিলুম তার সব বুঝি নি। কিন্তু পড়ে চলেছিলুম। আজও যা পড়ি তার সবটা বোঝা আমার পক্ষে অসম্ভব, অনেক বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতের পক্ষেও তাই।

বিজ্ঞান থেকে যাঁরা চিত্তের খাদ্য সংগ্রহ করতে পারেন তাঁরা তপস্বী। – মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ, আমি রস পাই মাত্র। সেটা গর্ব করবার মতো কিছু নয়, কিন্তু মন খুশি হয়ে বলে যথালাভ। এই বইখানা সেই যথালাভের ঝুলি, মাধুকরী বৃত্তি নিয়ে পাঁচ দরজা থেকে এর সংগ্রহ।

পাণ্ডিত্য বেশি নেই সুতরাং সেটাকে বেমালুম করে রাখতে বেশি চেষ্টা পেতে হয় নি। চেষ্টা করেছি ভাষার দিকে। বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ শিক্ষার জন্যে পারিভাষিকের প্রয়োজন আছে। কিন্তু পারিভাষিক চর্ব্যজাতের জিনিস। দাঁত-ওঠার পরে সেটা পথ্য। সেই কথা মনে করে যতদূর পারি পরিভাষা এড়িয়ে সহজ ভাষার দিকে মন দিয়েছি।

এই বইখানিতে একটি কথা লক্ষ্য করবে - এর নৌকোটা অর্থাৎ এর ভাষাটা যাতে সহজে চলে সে চেষ্টা এতে আছে কিন্তু মাল খুব বেশি কমিয়ে দিয়ে একে হালকা করা কর্তব্য বোধ করি নি। দয়া করে বঞ্চিত করাকে দয়া বলে না। আমার মত এই যে, যাদের মন কাঁচা তারা যতটা স্বভাবত পারে নেবে, না পারে আপনি ছেড়ে দিয়ে যাবে, তাই বলে তাদের পাতটাকে প্রায় ভোজ্যশূণ্য করে দেওয়া সদ্‌ব্যবহার নয়। যে-বিষয়টা শেখবার সামগ্রী, নিছক ভোগ করবার নয়, তার উপর দিয়ে অবাধে চোখ বুলিয়ে যাওয়াকে পড়া বলা যায় না। মন দেওয়া এবং চেষ্টা করে বোঝাটাও শিক্ষার অঙ্গ, সেটা আনন্দেরই সহচর। নিজের যে-শিক্ষার চেষ্টা বাল্যকালে নিজের হাতে গ্রহণ করেছিলুম তার থেকে আমার এই অভিজ্ঞতা। এক বয়সে দুধ যখন ভালোবাসতুম না, তখন গুরুজনদের ফাঁকি দেবার জন্যে দুধটাকে প্রায় আগাগোড়া ফেনিয়ে বাটি ভরতি করার চক্রান্ত করেছি। ছেলেদের পড়বার বই যাঁরা লেখেন, দেখি তাঁরা প্রচুর পরিমাণে ফেনার জোগান দিয়ে থাকেন। এইটে ভুলে যান, জ্ঞানের যেমন আনন্দ আছে তেমনি তার মূল্যও আছে, ছেলেবেলা থেকে মূল্য ফাঁকি দেওয়া অভ্যাস হতে থাকলে যথার্থ আনন্দের অধিকারকে ফাঁকি দেওয়া হয়। চিবিয়ে খাওয়াতেই একদিকে দাঁত শক্ত হয় আর-একদিকে খাওয়ার পুরো স্বাদ পাওয়া যায়, এ বই লেখবার সময়ে সে কথাটা সাধ্যমতো ভুলি নি।

শ্রীমান প্রমথনাথ সেনগুপ্ত এম. এসসি. তোমারই ভূতপূর্ব ছাত্র। তিনি শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান-অধ্যাপক। বইখানি লেখবার ভার প্রথমে তাঁর উপরেই দিয়েছিলেম। ক্রমশ সরে সরে ভারটা অনেকটা আমার উপরেই এসে পড়ল। তিনি না শুরু করলে আমি সমাধা করতে পারতুম না, তাছাড়া অনভ্যস্ত পথে শেষ পর্যন্ত অব্যবসায়ীর সাহসে কুলোত না তাঁর কাছ থেকে ভরসাও পেয়েছি সাহায্যও পেয়েছি।

আলমোড়ায় নিভৃতে এসে লেখাটাকে সম্পূর্ণ করতে পেরেছি। মস্ত সুযোগ হল আমার স্নেহাস্পদ বন্ধু বশী সেনকে পেয়ে। তিনি যত্ন করে এই রচনার সমস্তটা পড়েছেন। পড়ে খুশি হয়েছেন এইটেতেই আমার সব চেয়ে লাভ।

আমার অসুখ অবস্থায় স্নেহাস্পদ শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহাশয় যত্ন করে প্রুফ সংশোধন করে দিয়ে বইখানি প্রকাশের কাজে আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন; এজন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

শান্তিনিকেতন
২রা আশ্বিন ১৩৪৪

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরমাণুলোক

আমাদের সজীব দেহ কতকগুলি বোধের শক্তি নিয়ে জন্মেছে, যেমন দেখার বোধ, শোনার বোধ, ঘ্রাণের বোধ, স্বাদের বোধ, স্পর্শের বোধ। এইগুলিকে বলি অনুভূতি। এদের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের ভালোমন্দ-লাগা, আমাদের সুখদুঃখ।

আমাদের এই-সব অনুভূতির সীমানা বেশি বড়ো নয়। আমরা কতদূরই বা দেখতে পাই, কতটুকু শব্দই বা শুনি। অন্যান্য বোধগুলিরও দৌড় বেশি নয়। তার মানে আমরা যেটুকু বোধশক্তির সম্বল নিয়ে এসেছি সে কেবল এই পৃথিবীতেই আমাদের প্রাণ বাঁচিয়ে চলার হিসাবমত। আরো কিছু বাড়তি হাতে থাকে। তাতেই আমরা পশুর কোঠা পেরিয়ে মানুষের কোঠায় পৌঁছতে পারি।

যে নক্ষত্র থেকে এই পৃথিবীর জন্ম, যার জ্যোতি এর প্রাণকে পালন করছে সে হচ্ছে সূর্য। এই সূর্য আমাদের চার দিকে আলোর পর্দা টাঙিয়ে দিয়েছে। পৃথিবীকে ছাড়িয়ে জগতে আর যে কিছু আছে তা দেখতে দিচ্ছে না। কিন্তু দিন শেষ হয়, সূর্য অস্ত যায়, আলোর ঢাকা যায় সরে; তখন অন্ধকার ছেয়ে বেরিয়ে পড়ে অসংখ্য নক্ষত্র। বুঝতে পারি জগৎটার সীমানা পৃথিবী ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে গেছে। কিন্তু কতটা যে দূরে তা কেবল অনুভূতিতে ধরতে পারি নে।

সেই দূরত্বের সঙ্গে আমাদের একমাত্র যোগ চোখের দেখা দিয়ে। সেখান থেকে শব্দ আসে না, কেননা, শব্দের বোধ হাওয়ার থেকে। এই হাওয়া চাদরের মতোই পৃথিবীকে জড়িয়ে আছে। এই হাওয়া পৃথিবীর মধ্যেই শব্দ জাগায়, এবং শব্দের ঢেউ চালাচালি করে। পৃথিবীর বাইরে ঘ্রাণ আর স্বাদের কোনো অর্থই নেই। আমাদের স্পর্শবোধের সঙ্গে আমাদের আর-একটা বোধ আছে, ঠাণ্ডা-গরমের বোধ। পৃথিবীর বাইরের সঙ্গে আমাদের এই বোধটার অন্তত এক জায়গায় খুবই যোগ আছে। সূর্যের থেকে রোদ্দুর আসে, রোদ্দুর

থেকে পাই গরম। সেই গরমে আমাদের প্রাণ। সূর্যের চেয়ে লক্ষ গুণ গরম নক্ষত্র আছে। তার তাপ আমাদের বোধে পৌঁছয় না। কিন্তু সূর্যকে তো আমাদের পর বলা যায় না। অন্য যে-সব অসংখ্য নক্ষত্র নিয়ে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, সূর্য তাদের মধ্যে সকলের চেয়ে আমাদের আত্মীয়। তবু মানতে হবে, সূর্য পৃথিবীর থেকে আছে দূরে। কম দূরে নয়, প্রায় ন'কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল তার দূরত্ব। শুনে চমকে উঠলে চলবে না। যে ব্রহ্মাণ্ডে আমরা আছি এখানে ঐ দূরত্বটা নক্ষত্রলোকের সকলের চেয়ে নীচের ক্লাসের। কোনো নক্ষত্রই ওর চেয়ে পৃথিবীর কাছে নেই।

এই-সব দূরের কথা শুনে আমাদের মনে চমক লাগে তার কারণ জলে মাটিতে তৈরি এই পিণ্ডটি, এই পৃথিবী, অতি ছোটো। পৃথিবীর দীর্ঘতম লাইনটি অর্থাৎ তার বিষুবরেখার কটিবেষ্টন ঘুরে আসবার পথ প্রায় পঁচিশ হাজার মাইল মাত্র। বিশ্বের পরিচয় যতই এগোবে ততই দেখতে পাবে জগতের বৃহত্ত্ব বা দূরত্বের ফর্দে এই পঁচিশ হাজার সংখ্যাটা অত্যন্ত নগণ্য। পূর্বেই বলেছি আমাদের বোধশক্তির সীমা অতি ছোটো। সর্বদা যেটুকু দূরত্ব নিয়ে আমাদের কারবার করতে হয় তা কতটুকুই বা। ঐ সামান্য দূরত্বটুকুর মধ্যেই আমাদের দেখার আমাদের চলাফেরার বরাদ্দ নির্দিষ্ট।

কিন্তু পর্দা যখন উঠে গেল, তখন আমাদের অনুভূতির সামান্য সীমানার মধ্যেই বৃহৎ বিশ্ব নিজেকে নিতান্ত ছোটো ক'রে একটুখানি আভাসে জানান দিলে, তা না হলে জানা হতই না; কেননা, বড়ো দেখার চোখ আমাদের নয়। অন্য জীবজন্তুরা এইটুকু দেখাই মেনে নিলে। যতটুকু তাদের অনুভূতিতে ধরা দিল ততটুকুতেই তারা সন্তুষ্ট হল। মানুষ হল না। ইন্দ্রিয়বোধে জিনিসটার একটূ ইশারা মাত্র পাওয়া গেল। কিন্তু মানুষের বুদ্ধির দৌড় তার বোধের চেয়ে আরো অনেক বেশি, জগতের সকল দৌড়ের সঙ্গেই সে পাল্লা দেবার স্পর্ধা রাখে। সে এই প্রকাণ্ড জগতের প্রকাণ্ড মাপের খবর জানতে বেরল, অনুভূতির ছেলেভুলোনো গুজব দিলে বাতিল করে। ন'কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইলকে আমরা কোনোমতেই অনুভব করতে পারি নে, কিন্তু বুদ্ধি হার মানলে না, হিসেব কষতে বসল।

বাইরের বিশ্বলোকটার কথা থাক্, আমরা যে পৃথিবীতে আছি, তার চেয়ে কাছে তো আর কিছুই নেই, তবু এর সমস্তটাকে এক ক'রে দেখা আমাদের বোধের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু একটি ছোটো গ্লোবে যদি তার ম্যাপ আঁকা দেখি, তা হলে পৃথিবীর সমগ্রটাকে জানার একটুখানি গোড়াপত্তন হয়। আয়তন হিসাবে গ্লোবটি পৃথিবীর অনেক-হাজার ভাগের একভাগমাত্র। আমাদের অন্য-সব বোধ বাদ দিয়ে কেবলমাত্র দৃষ্টিবোধের আঁচড়কাটা পরিচয় এতে আছে। বিস্তারিত বিবরণ হিসাবে, এ একেবারে ফাঁকা। বেশি দেখবার শক্তি আমাদের নেই বলেই ছোটো করেই দেখাতে হল।

প্রতিরাত্রে বিশ্বকে এই যে ছোটো করেই দেখানো হয়েছে সেও আমাদের মাথার উপরকার আকাশের গ্লোবে। দৃষ্টিবোধ ছাড়া অন্য কোনো বোধ এর মধ্যে জায়গা পায় না। যা চিন্তা করতে মন অভিভূত হয়ে যায় এত বড়ো জিনিসকে দিকসীমানায় বদ্ধ এই আকাশটুকুর মধ্যে আমাদের কাছে ধরা হল।

কতই ছোটো করে ধরা হয়েছে তার একটুখানি আন্দাজ পেতে হলে সূর্যের দৃষ্টান্ত মনে আনতে হবে। স্বভাবতই আমরা যতকিছু বড়ো জিনিসকে জানি বা মনে আনতে পারি তার মধ্যে সব চেয়ে বড়ো এই পৃথিবী। একে আমরা অংশ অংশ করেই দেখতে পারি। একসঙ্গে সবটার প্রকৃত ধারণা আমাদের বোধের পক্ষে অসম্ভব। অথচ সূর্য এই পৃথিবীর চেয়ে প্রায় তেরো লক্ষ গুণ বড়ো। এতবড়ো সূর্য আকাশের একটা ধারে আমাদের কাছে দেখা দিয়েছে একটি সোনার থালার মতো। সূর্যের ভিতরকার সমস্ত তুমুল তোলপাড়ের যখন খবর পাই আর তার পরে যখন দেখি ভোরবেলায় আমাদের আমবাগানের পিছন থেকে সোনার গোলকটি ধীরে ধীরে উপরে উঠে আসছে, জীবজন্তু গাছপালা আনন্দিত হয়ে উঠছে,তখন মনে ভাবি আমাদের কিরকম ভুলিয়ে রাখা হয়েছে; আমাদের বলে দিয়েছে তোমাদের জীবনের কাজে এর বেশি জানবার কোনো দরকার নেই। না ভোলালেই বা বাঁচতুম কী করে। ঐ সূর্য আপন বিরাট স্বরূপে যা, সে যদি আমাদের অনুভূতির অল্পমাত্রও কাছে আসত তা হলে তো আমরা মুহূর্তেই লোপ পেয়ে যেতুম। এই তো গেল সূর্য। এই সূর্যের চেয়ে আরো অনেক গুণ বড়ো আছে আরো অনেক অনেক

নক্ষত্র। তাদের দেখছি কতকগুলি আলোর ফুটকির মতো। যে-দূরত্বের মধ্যে এই-সব নক্ষত্র ছড়ানো, ভেবে তার কিনারা পাওয়া যায় না। বিশ্বজগতের বাসা যে আকাশটাতে সেটা যে কত বড়ো সে কথা আর-একদিক থেকে ভেবে দেখা যেতে পারে। আমাদের তাপবোধে পৃথিবীর বাইরে থেকে একটা খুব বড়ো খবর খুব জোরের সঙ্গে এসে পৌঁচচ্ছে, সে হচ্ছে রৌদ্রের উত্তাপ। এ খবরটা ন'কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরের। কিন্তু ঐ তো আকাশে আকাশে আছে বহুকোটি নক্ষত্র, তাদের মধ্যে কোনো-কোনোটি সূর্যের চেয়ে বহুগুণ বেশি উত্তপ্ত। কিন্তু আমাদের ভাগ্যগুণে তাদের সম্মিলিত গরম পথেই এতটা মারা গেল যে বিশ্বজোড়া অগ্নিকাণ্ডে আমাদের আকাশটা দুঃসহ হল না। কত দূরের এই পথ, কত প্রকাণ্ড এই আকাশ। তাপের অনুভূতিকে স্পর্শ করা ন'কোটি মাইল তার কাছে তুচ্ছ। বড়ো যজ্ঞের রান্নাঘরে যে চুলি জ্বলছে তার কাছে বসা আরামের নয়, কিন্তু বেলা দশটার কাছাকাছি শহরের সমস্ত রান্নাঘরে যে আগুন জ্বলে বড়ো আকাশে তা ছড়িয়ে যায় বলেই শহরে বাস করতে পারি। নক্ষত্রলোকের ব্যাপারটাও সেইরকম। সেখানকার আগুনের ঘটা যতই প্রচণ্ড হোক, তার চার দিকের আকাশটা আরো অনেক প্রকাণ্ড।

এই বিরাট দূরত্ব থেকে নক্ষত্রদের অস্তিত্বের খবর এনে দিচ্ছে কিসে। সহজ উত্তর হচ্ছে আলো। কিন্তু আলো যে চুপচাপ বসে খবর আউড়িয়ে যায় না, আলো যে ডাকের পেয়াদার মতো খবর পিঠে করে নিয়ে দৌড়ে চলে, বিজ্ঞানের এক একটা মস্ত আবিষ্কার। চলা বলতে সামান্য চলা নয়, এমন চলা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আর কোনো দূতেরই নেই। আমরা ছোটো পৃথিবীর মানুষ, তাই এতকাল জগতের সব চেয়ে বড়ো চলার কথাটা জানবার সুযোগ পাই নি। একদিন বিজ্ঞানীদের অত্যাশ্চর্য হিসাবের কলে ধরা পড়ে গেল, আলো চলে সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে। এমন একটা বেগ যা অঙ্কে লেখা যায়, মনে আনা যায় না। বুদ্ধিতে যার পরীক্ষা হয়, অনুভবে হয় না। আলোর এই চলনের দৌড় অনুভবে বুঝব, এই পৃথিবীটুকুতে এত বড়ো জায়গা পাব কোথায়। এইটুকুর মধ্যে ওর চলাকে আমরা না-চলার মতোই দেখে আসছি। পরখ করবার মতো স্থান পাওয়া যায় মহাশূণ্যে। সূর্য আছে সেই মহাশূণ্যের যে দূরত্বমাত্রা নিয়ে, সে যত কোটি মাইল হোক জ্যোতিষ্কলোকের দূরত্বের মাপকাঠিতে খুব বেশি নয়।

সুতরাং এইকুটু দূরত্বের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ছোটো মাপে মানুষ আলোর দৌড় দেখতে পেল। খবর মিলল যে, এই শূণ্য পেরিয়ে সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসে প্রায় সাড়ে আট মিনিটে। অর্থাৎ আমাদের দৃষ্টির পাল্লায় সূর্য যখন উপস্থিত, আসলে তার আগেই সে এসেছে। এই আগমনের খবরটি জানাতে আলো-নকিবের মিনিট আষ্টেক দেরি হল। এইটুকু দেরিতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। প্রায় তাজা খবরই পাওয়া গেছে। কিন্তু সৌরজগতের সব চেয়ে কাছে আছে যে নক্ষত্র, অর্থাৎ নক্ষত্রমহলে যাকে আমাদের পাড়াপড়শি বললে চলে, যখন সে জানান দিল “এই যে আছি’ তখন তার সেই বার্তা বয়ে আনতে আলোর সময় লাগছে চার বছরের কাছাকাছি। অর্থাৎ এইমাত্র যে খবর পাওয়া গেল সেটা চার বছরে বাসি। এইখানে দাঁড়ি টানলেই যথেষ্ট হত, কিন্তু আরো দূরের নক্ষত্র আছে যেখান থেকে আলো আসতে বহু লক্ষ বছর লাগে।

আকাশে আলোর এই চলাচলের খবর বেয়ে বিজ্ঞানে একটা প্রশ্ন উঠল, তার চলার ভঙ্গিটা কী রকম। সেও এক আশ্চর্য কথা। উত্তর পাওয়া গেছে তার চলা অতি সূক্ষ্ম ঢেউয়ের মতো। কিসের ঢেউ সে কথা ভেবে পাওয়া যায় না; কেবল আলোর ব্যবহার থেকে এটা মোটামুটি জানা গেছে ওটা ঢেউ বটে। কিন্তু মানুষের মনকে হয়রান করবার জন্যে সঙ্গে সঙ্গেই একটা জুড়িখবর তার সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ নিয়ে হাজির হল, জানিয়ে দিলে আলো অসংখ্য জ্যোতিষ্কণা নিয়ে; অতি খুদে ছিটেগুলির মতো ক্রমাগত তার বর্ষণ। এই দুটো উলটো খবরের মিলন হল কোন্‌খানে তা ভেবে পাওয়া যায় না। এর চেয়েও আশ্চর্য একটা পরস্পর উলটো কথা আছে, সে হচ্ছে এই যে বাইরে যেটা ঘটছে সেটা একটা-কিছু ঢেউ আর বর্ষণ, আর ভিতরে আমরা যা পাচ্ছি তা, না এটা, না ওটা, তাকে আমরা বলি আলো; এর মানে কী, কোনো পণ্ডিত তা বলতে পারলেন না।

যা ভেবে ওঠা যায় না, যা দেখাশোনার বাইরে, তার এত সূক্ষ্ম এবং এত প্রকাণ্ড খবর পাওয়া গেল কী করে, এ প্রশ্ন মনে আসতে পারে। নিশ্চিত প্রমাণ আছে, আপাতত এ কথা মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। যাঁরা প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন অসাধারণ তাঁদের

জ্ঞানের তপস্যা, অত্যন্ত দুর্গম তাঁদের সন্ধানের পথ। তাঁদের কথা যাচাই করে নিতে যে বিদ্যাবুদ্ধির দরকার, তাও আমাদের অনেকের নেই। অল্প বিদ্যা নিয়ে অবিশ্বাস করতে গেলে ঠকতে হবে। প্রমাণের রাস্তা খোলাই আছে। সেই রাস্তায় চলবার সাধনা যদি কর, শক্তি যদি হয়, তবে একদিন এ-সব বিষয় নিয়ে সওয়ালজবাব সহজেই হতে পারবে।

আপাতত আলোর ঢেউয়ের কথাই বুঝে নেওয়া যাক। এই ঢেউ একটিমাত্র ঢেউয়ের ধারা নয়। এর সঙ্গে অনেক ঢেউ দল বেঁধেছে। কতকগুলি চোখে পেড়, অনেকগুলি পড়ে না। এইখানে বলে রাখা ভালো, যে আলো চোখে পড়ে না, চলতি ভাষায় তাকে আলো বলে না; কিন্তু দৃশ্যই হোক অদৃশ্যই হোক একটা-কোনো শক্তির এই ধরনের ঢেউখেলিয়ে চলাই যখন উভয়ের স্বভাব তখন বিশ্বতত্ত্বের বইয়ে ওদের পৃথক নাম অসংগত। বড়োভাই নামজাদা, ছোটোভাইকে কেউ জানে না, তবু বংশগত ঐক্য ধরে উভয়েরই থাকে একই উপাধি, এও তেমনি।

আলোর ঢেউয়ের আপন দলের আরো একটি ঢেউ আছে, সেটা চোখে দেখি নে, স্পর্শে বুঝি। সেটা তাপের ঢেউ। সৃষ্টির কাছে তার খুবই প্রতাপ। এমনিতরো আলোর-ঢেউজাতীয় নানা পদার্থের কোনোটা দেখা যায়, কোনোটা স্পর্শে বোঝা যায়; কোনোটাকে স্পষ্ট আলোরূপে জানি আবার সঙ্গে সঙ্গেই তাপরূপেও বুঝি; কোনোটাকে দেখাও যায় না, স্পর্শেও পাওয়া যায় না। আমাদের কাছে প্রকাশিত অপ্রকাশিত আলোতরঙ্গের ভিড়কে যদি এক নাম দিতে হয়, তবে তাকে তেজ বলা যেতে পারে। বিশ্বসৃষ্টির আদি অন্তে মধ্যে প্রকাশ্যে আছে বা লুকিয়ে আছে বিভিন্ন অবস্থায় এই তেজের কাঁপন। পাথর হোক লোহা হোক বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় তাদের মধ্যে কোনো নড়াচড়া নেই। তারা যেন স্থিরত্বের আদর্শস্থল। কিন্তু এ কথা প্রমাণ হয়ে গেছে যে তাদের অণু পরমাণু, অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম পদার্থ, যাদের দেখতে পাই নে অথচ যাদের মিলিয়ে নিয়ে এরা আগাগোড়া তৈরি, তারা সকল সময়েই ভিতরে ভিতরে কাঁপছে। ঠাণ্ডা যখন থাকে তখনো কাঁপছে, আর কাঁপুনি যখন আরো চড়ে ওঠে তখন গরম হয়ে বাইরে থেকেই ধরা পড়ে আমাদের বোধশক্তিতে। আগুনে পোড়ালে লোহার পরমাণু কাঁপতে কাঁপতে এত বেশি অস্থির হয়ে

ওঠে যে তার উত্তেজনা আর লুকানো থাকে না। তখন কাঁপনের ঢেউ আমাদের শরীরের স্পর্শনাড়ীকে ঘা মেরে তার মধ্য দিয়ে যে খবরটা চালিয়ে দেয় তাকে বলি গরম। বস্তুত গরমটা আমাদের মারে। আলো মারে চোখে, গরম মারে গায়ে।

ছেলেবেলায় যখন একদিন মাস্টারমশায় দেখিয়ে দিলেন লোহার টুকরো আগুনে তাতিয়ে প্রথমে হয় গরম, তার পরে হয় লাল টক্‌টকে, তার পরে হয় সাদা জ্বল্‌জ্বলে,বেশ মনে আছে তখন আমাকে এই কথা নিয়ে ভাবিয়েছিল যে, আগুন তো কোনো-একটা দ্রব্য নয় যেটা লোহার সঙ্গে বাইরে থেকে মিশিয়ে লোহাকে দিয়ে এমনতরো চেহারা বদল করাতে পারে। তার পরে আজ শুনছি আরো তাপ দিলে এই লোহাটা গ্যাস হয়ে যাবে। এ-সমস্তই জাদুকর তাপের কাণ্ড, সৃষ্টির আরম্ভ থেকে আজ পর্যন্ত চলেছে।

সূর্যের আলো সাদা। এই সাদা রঙে মিলিয়ে আছে সাতটা বিভিন্ন রঙের আলো। যেন সাতরঙের রশ্মির পেখম, গুটিয়ে ফেললে দেখায় সাদা, ছড়িয়ে ফেললে দেখায় সাতরঙা। সেকালে ছিল ঝাড়লণ্ঠন, বিজলিবাতির তাড়ায় তারা হয়েছে দেশছাড়া। এই ঝাড়ের গায়ে দুলত তিনপিঠওয়ালা কাঁচের পরকলা। এইরকম তিনপিঠওয়ালা কাঁচের গুণ এই যে, ওর ভিতর দিয়ে রোদ্‌দুর এলে তার থেকে সাত রঙের আলো ভেঙে ছড়িয়ে পড়ে। পরে পরে রঙ বিছানো হয়; বেগনি (□□□□□□), অতিনীল (□□□□□□),নীল (আরয়ন), সবুজ (□□□□□), হলদে (□□□□□□), নারঙি (□□□□□□), আর লাল (Red)। এই সাতটা রঙ চোখে দেখা যায় কিন্তু এদের দুই প্রান্তের বাইরে তেজের আরো অনেক ছোটো-বড়ো ঢেউ আছে, তারা আমাদের সহজ চেতনায় ধরা দেয় না। সেই জাতের যে ঢেউ বেগনি রঙের পরের পারে তাকে বলে □□□□□-□□□□□□□ □□□□□, সহজ ভাষায় বলা যাক বেগনি-পারের আলো। আর যে আলো লালের এলাকায় এসে পৌঁছয় নি, রয়েছে তার আগের পারে তাকে বলে □□□□□-□□□ □□□□□, আমরা বলতে পারি লাল-উজানি আলো। স্যর উইলিয়ম হার্শল ছিলেন এক মস্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানী। তিনপিঠওয়ালা কাঁচের মধ্য দিয়ে তিনি পরীক্ষা করে দেখেছিলেন আলোর সাতরঙা ছটা। কালোরঙ-করা

তাপ-মাপের নল নিয়ে এক-একটা রঙের কাছে ধরে দেখলেন। লালরঙের দিকে উত্তাপ ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল। লাল পেরিয়ে নলটিকে নিয়ে গেলেন বেরঙা অন্ধকারে, সেখানেও গরম থামতে চায় না। বোঝা গেল আরো আলো আছে ঐ অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে। তার পর এলেন এক জর্মন রসায়নী। একটা ফোটোগ্রাফির প্লেট নিয়ে পরীক্ষায় লাগলেন। এই প্লেটে লাল থেকে বেগনি পর্যন্ত সাতটা রঙের সাড়া পাওয়া গেল। শেষে বেগনি পেরিয়ে চললেন অন্ধকারে, সেখানে চোখে যা ধরা দেয় না প্লেটে তা ধরা পড়ল। দেখা গেল আলোর উত্তাপটা লালরঙের দিকে, আর রাসায়ণিক ক্রিয়া বেগনি পারের দিকে। এক কালে মনে হয়েছিল অ-দেখারা রঙিন দলেরই পার্শ্বচর, অন্ধকারে পড়ে গেছে। যত এগোতে লাগল গুপ্ত আলোর সন্ধান, ততই সাতরঙা দলেরই আসন হল খাটো। বিজ্ঞানের জরীপে আলোর সীমানা আজ সাতরঙ রাজার দেশ ছাড়িয়ে গেছে শতগুণ। লাল-উজানি আলোর দিকে ক্রমে আজ দেখা দিল যে ঢেউ সেই ঢেউ বেয়ে চলে আকাশবাণী, যাকে বলে রেডিয়োবার্তা; বেগনি-পারের দিকে প্রকাশ পেল বিখ্যাত র‍্যন্টগেন আলো, যে-আলোর সাহায্যে দেহের চামড়ার ঢাকা পেরিয়ে ভিতরকার হাড় দেখতে পাওয়া যায়।

আলো জিনিসটাতে কেবল যে নক্ষত্রের অস্তিত্বের খবর দেয় তা নয়, ওদের মধ্যে কোন্ কোন্ পদার্থ মিলিয়ে আছে, মানুষ সে খবরও আলোর যেন বুক চিরে আদায় করে নিয়েছে। কেমন করে আদায় হল বুঝিয়ে বলা যাক।

তিনপিঠওয়ালা কাঁচের ভিতর দিয়ে সূর্যের সাদা আলো পার করলে তার সাতটা রঙের পরিচয় পরে পরে বেরিয়ে পড়ে। লোহা প্রভৃতি শক্ত জিনিস যথেষ্ট তেতে জ্বলে উঠলে তার আলো যখন ক্রমে সাদা হয়ে ওঠে তখন এই সাদা আলো ভাগ করলে সাত রঙের ছটা পাশাপাশি দেখা যায়। তাদের মাঝে মাঝে কোনো ফাঁক থাকে না কিন্তু লোহাকে গরম করতে করতে যখন তা গ্যাস হয়ে যায় তখন ঐ কাঁচের ভিতর দিয়ে তার আলো ভাঙলে বর্ণচ্ছটায় একটানা পাই নে। দেখা যায় আলাদা আলাদা উজ্জ্বল রেখা,

তাদের মধ্যে মধ্যে থাকে আলোহীন ফাঁকা জায়গা। এই বর্ণালোকচিহ্নপাতের নাম দেওয়া যাক বর্ণলিপি।

এই লিপিতে দেখা গেছে দীপ্ত গ্যাসীয় অবস্থায় প্রত্যেক জিনিসের আলোর বর্ণচ্ছটা স্বতন্ত্র। নুনের মধ্যে সোডিয়ম নামক এক মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায়। তাপ দিয়ে দিয়ে তাকে গ্যাস করে ফেললে বর্ণলিপিতে তার আলোর মধ্যে খুব কাছাকাছি দেখা যায় দুটি হলদে রেখা। আর-কোনো রঙ পাই নে। সোডিয়ম ছাড়া অন্য কোনো জিনিসেরই বর্ণচ্ছটায় ঠিক ঐ জায়গাতেই ঐ দুটি রেখা মেলে না। ঐ দুটি রেখা যেখানকারই গ্যাসের বর্ণলিপিতে দেখা যাবে বুঝব সোডিয়ম আছেই।

কিন্তু দেখা যায় সূর্যের আলোর বর্ণচ্ছটায় সোডিয়ম গ্যাসের ঐ দুটি উজ্জ্বল হলদে রেখা চুরি গেছে, তার জায়গায় রয়েছে দুটো কালো দাগ। বিজ্ঞানী বলেন উত্তপ্ত কোনো গ্যাসীয় জিনিসের আলো সেই গ্যাসেরই অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা স্তরের ভিতর দিয়ে আসার সময় সম্পূর্ণ শোষিত হয়। এ ক্ষেত্রে আলোর অভাবেই যে কালো দাগের সৃষ্টি তা নয়। বস্তুত সূর্যের বর্ণমণ্ডলে যে সোডিয়ম গ্যাস সূর্যের আলো আটক করে সেও আপন উত্তাপ অনুযায়ী আলো ছড়িয়ে দেয়, আলোকমণ্ডলের তুলনায় উত্তাপ কম ব'লে এর আলো হয় অনেকটা ম্লান। এই ম্লান আলো বর্ণচ্ছটায় উজ্জ্বল আলোর পাশে কালোর বিভ্রম জন্মায়।

মৌলিক জিনিস মাত্রেরই আলো ভেঙে প্রত্যেকটির বর্ণচ্ছটার ফর্দ তৈরি হয়ে গেছে। এই বর্ণভেদের সঙ্গে তুলনা করলেই বস্তুভেদ ধরা পড়বে তা সে যেখানেই থাক্, কেবল গ্যাসীয় অবস্থায় থাকা চাই।

পৃথিবী থেকে যে বিরেনব্বইটি মৌলিক পদার্থের খবর পাওয়া গেছে সূর্যে তার সবগুলিরই থাকা উচিত; কেননা, পৃথিবী সূর্যেরই দেহজাত। প্রথম পরীক্ষায় পাওয়া গিয়েছিল ছত্রিশটি মাত্র জিনিস। বাকিগুলির কী হল সেই প্রশ্নের মীমাংসা করছেন বাঙালি বিজ্ঞানি মেঘনাদ সাহা। নূতন সন্ধানপথ বের করে পরে সূর্যে আরো কতকগুলি মৌলিক

জিনিস তিনি ধরতে পেরেছেন। তাঁর পথ বেয়ে প্রায় সবগুলিরই খবর মিলেছে। আজও যেগুলি গরঠিকানা মাঝপথেই পৃথিবীর হাওয়া তাদের সংবাদ শুষে নেয়।

সব রঙ মিলে সূর্যের আলো সাদা, তবে কেন নানা জিনিসের নানা রঙ দেখি। তার কারণ সব জিনিস সব রঙ নিজের মধ্যে নেয় না, কোনো-কোনোটাকে বিনা ওজরে বাইরে বিদায় করে দেয়। সেই ফেরত-দেওয়া রঙটাই আমাদের চোখের লাভ। মোটা ব্লটিং যে রসটা শুষে ফেলে সে কারো ভোগে লাগে না, যে রসটা সে নেয় না সেই উদ্‌বৃত্ত রসটাই আমাদের পাওনা। এও তেমনি। চুনি পাথর সূর্যকিরণের আর-সবরকম ঢেউকেই মেনে নেয়, ফিরিয়ে দেয় লাল রঙকে। তার এই ত্যাগের দানেই চুনির খ্যাতি। যা নিজে আত্মসাৎ করেছে তার কোনো খ্যাতি নেই। লাল রঙটাই কেন যে ও নেয় না আর নীল রঙের ‘পরেই নীলা পাথরের কেন সম্পূর্ণ বৈরাগ্য এ প্রশ্নের জবাব ওদের পরমাণু-মহলে লুকানো রইল। সূর্যের সব ঢেউকেই পাকা-চুল ফিরে পাঠায় তাই সে সাদা, কাঁচা-চুল কোনো ঢেউই ফিরে দেয়না, অর্থাৎ আলোর কোনো অংশই তার কাছ থেকে ছাড়া পায় না, তাই সে কালো। জগতের সব জিনিসই যদি সূর্যের সব রঙই করত আত্মসাৎ তা হলে সেই কৃপণের জগৎটা দেখা দিত কালো হয়ে, অর্থাৎ দেখাই দিত না। যেন খবর বিলোবার সাতটা পেয়াদাকেই পোস্টমাস্টার বন্ধ করে রাখত। অথচ কোনো আলোই যদি না নিত সবই হত সাদা, তবে সেই একাকারে সব জিনিসেরই প্রভেদ যেত ঘুচে। যেন সাতটা পেয়াদার সব চিঠিই তাল পাকিয়ে একখানা করা হত, কোনো স্বতন্ত্র খবরই পাওয়া যেত না। একই চেহারায় সবাইকে দেখাকে দেখা বলে না। না-আলো আর পূর্ণ-আলো কোনোটাতেই আমাদের দেখা চলে না, আমরা দেখি ভাঙা আলোর মেলামেশায়।

সূর্যকিরণের সঙ্গে জড়ানো এমন অনেক ঢেউ আছে, যারা অতি অল্প পরিমাণে আসে ব’লে অনুভব করতে পারি নে। এমন ঢেউও আছে যারা প্রচুর পরিমাণেই নেমে আসে, কিন্তু পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল তাদের আটক করে। নইলে জ্বলে পুড়ে মরতে হত। সূর্যের যে পরিমাণ দান আমরা সইতে পারি প্রথম থেকেই তাই নিয়ে আমাদের দেহতন্ত্রের বোঝাপড়া হয়ে গেছে। তাই বাইরে আমাদের জীবনযাত্রার কারবার বন্‌ধ।

বিশ্বছবিতে সব চেয়ে যা আমাদের চোখে পড়ে সে হল নক্ষত্রলোক, আর সূর্য, সেও একটা নক্ষত্র। মানুষের মনে এতকাল এরা প্রাধান্য পেয়ে এসেছে। বর্তমান যুগে সব চেয়ে মানুষকে আশ্চর্য করে দিয়েচে এই বিশ্বের ভিতরকার লুকানো বিশ্ব, যা অতি সূক্ষ্ম, যা চোখে দেখা যায় না, অথচ যা সমস্ত সৃষ্টির মূলে।

একটা মাটির ঘর নিয়ে যদি পরখ ক'রে বের করতে চাই তার গোড়াকার জিনিসটা কী, তা হলে পাওয়া যাবে ধুলোর কণা। যখন তাকে আর গুঁড়ো করা চলবে না তখন বলব এই অতি সূক্ষ্ম ধুলোই মাটির ঘরের আদিম মালমসলা। তেমনি করেই মানুষ একদিন ভেবেছিল, বিশ্বের পদার্থগুলিকে ভাগ করতে করতে যখন এমন সূক্ষ্মে এসে ঠেকবে যে তাকে আর ভাগ করা যাবে না তখন সেইটেকেই বলব বিশ্বের আদিভূত, অর্থাৎ গোড়াকার সামগ্রী। আমাদের শাস্ত্রে তাকে বলে পরমাণু, য়ুরোপীয় শাস্ত্রে বলে অ্যাটম। এরা এত সূক্ষ্ম যে দশকোটি পরমাণুকে পাশাপাশি সাজালে তার মাপ হবে এক ইঞ্চি মাত্র।

সহজ উপায়ে ধুলোর কণাকে আর আমরা ভাগ করতে পারি নে কিন্তু বৈজ্ঞানিক তাড়নে বিশ্বের সকল সামগ্রীকে আরো অনেক বেশি সূক্ষ্মে নিয়ে যেতে পেরেছে। শেষকালে এসে ঠেকেছে বিরেনব্বইটা অমিশ্র পদার্থে। পণ্ডিতেরা বললেন এদেরই যোগ-বিয়োগে জগতের যতকিছু জিনিস গড়া হয়েছে, এদের সীমান্ত পেরোবার জো নেই।

মনে করা যাক, মাটির ঘরের এক অংশ তৈরি খাঁটি মাটি দিয়ে, আর-এক অংশ মাটিতে গোবরে মিলিয়ে। তা হলে দেয়াল গুঁড়িয়ে দুরকম জিনিস পাওয়া যাবে, এক বিশুদ্ধ ধুলোর কণা, আর-এক ধুলোর সঙ্গে মেশানো গোবরের গুঁড়ো। তেমনি বিশ্বের সব জিনিস পরখ ক'রে বিজ্ঞানীরা তাদের দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন, এক ভাগের নাম মৌলিক, আর-এক ভাগের নাম যৌগিক। মৌলিক পদার্থে কোনো মিশল নেই, আর যৌগিক পদার্থে এক বা আরো বেশি জিনিসের যোগ আছে। সোনা মৌলিক, ওকে সাধারণ

উপায়ের যত সূক্ষ্ম ভাগ কর সোনা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাবে না। জল যৌগিক, ওকে ভাগ করলে দুটো মৌলিক গ্যাস বেরিয়ে পড়ে, একটার নাম অক্সিজেন আর-একটার নাম হাইড্রজেন। এই দুটি গ্যাস যখন স্বতন্ত্র থাকে তখন তাদের একরকমের গুণ, আর যেই তারা মিশে হয় জল, তখনই তাদের আর চেনবার জো থাকে না, তাদের মিলনে সম্পূর্ণ নূতন স্বভাব উৎপন্ন হয়। যৌগিক পদার্থ মাত্রেরই এই দশা। তারা আপনার মধ্যে আপন আদিপদার্থের পরিচয় গোপন করে। যা হোক এই-সব অ্যাটম পদবিওয়ালারাই একদিন খ্যাতি পেয়েছিল জগতের মূল উপাদান ব'লে; সবাই বলেছিল, এদের ধাতে আর একটুও ভাগ সয় না। কিন্তু শেষকালে তারও ভাগ বেরল। যাকে পরমাণু বলা হয়েছে তাকেও ভাঙতে ভাঙতে ভিতরে পাওয়া গেল অতিপরমাণু; সে এক অপরূপ জিনিস, তাকে জিনিস বলতেও মুখে বাধে। বুঝিয়ে বলা যাক।

আজকাল ইলেকট্রিসিটি শব্দটা খুব চলতি – ইলেকট্রিক বাতি, ইলেকট্রিক মশাল, ইলেকট্রিক পাখা এমন আরো কত কী। সকলেরই জানা আছে ওটা একরকমের তেজ। এও সবাই জানে মেঘের মধ্যে থেকে আকাশে যা চমক দেয় সেই বিদ্যুৎও ইলেকট্রিসিটি ছাড়া আর কিছু নয়। এই বিদ্যুৎই পৃথিবীতে আমাদের কাছে সব চেয়ে প্রবল প্রতাপে ইলেকট্রিসিটিকে, আলোয় এবং গর্জনে ঘোষণা করে। গায়ে লাগলে সাংঘাতিক হয়ে ওঠে। ইলেকট্রিসিটি শব্দটাকে আমরা বাংলায় বলব বৈদ্যুত।

এই বৈদ্যুৎ আছে দুই জাতের। বিজ্ঞানীরা এক জাতের নাম দিয়েছেন পজিটিভ, আর-এক জাতের নাম নেগেটিভ। তর্জমা করলে দাঁড়ায় হাঁ-ধর্মী আর না-ধর্মী। এদের মেজাজ পরস্পরের উলটো, এই বিপরীতকে মিলিয়ে দিয়ে হয়েছে সমস্ত যা-কিছু। অথচ পজিটিভের প্রতি পজিটিভের, নেগেটিভের প্রতি নেগেটিভের একটা স্বভাবগত বিরুদ্ধতা আছে, এদের টানটা বিপরীত পক্ষের দিকে।

এই দুই জাতের অতি সূক্ষ্ম বৈদ্যুৎকণা জোট বেঁধেছে পরমাণুতে। এই দুই পক্ষকে নিয়ে প্রত্যেক পরমাণু যেন গ্রহে সূর্যে মিলন-বাঁধা। সৌরমণ্ডলের মতো। সূর্য যেমন

সৌরলোকের কেন্দ্রে থেকে টানের লাগামে ঘোরাচ্ছে পৃথিবীকে, পজিটিভ বৈদ্যুৎকণা তেমনি পরমাণুর কেন্দ্রে থেকে টান দিচ্ছে নেগেটিভ কণাগুলোকে, আর তারা সার্কাসের ঘোড়ার মতো লাগামধারী পজিটিভের চার দিকে ঘুরছে।

পৃথিবী ঘুরছে সূর্যের চার দিকে, নয় কোটি মাইলের দূরত্ব রক্ষা করে। আয়তনের তুলনায় অতিপরমাণুদের কক্ষপথের দূরত্ব অনুপাতে তার চেয়ে বেশি বৈ কম নয়। পরমাণু যে অণুতম আকাশ অধিকার করে আছে তার মধ্যেও দূরত্বের প্রভূত কম-বেশি আছে। ইতিপূর্বে নক্ষত্রলোকে বৃহত্ত্বের ও পরস্পর-দূরত্বের অতি প্রকাণ্ডতার কথা বলেছি, কিন্তু অতি ছোটোকেও বলা যেতে পারে অতি প্রকাণ্ড ছোটো। বৃহৎ প্রকাণ্ডতার সীমাকে সংখ্যাচিহ্ন দিয়ে ঘের দিতে গেলে যেমন একের পিছনে বিশ-পঁচিশটা অঙ্কপাত করতে হয় ক্ষুদ্রতম প্রকাণ্ডতা সম্বন্ধে সেই একই কথা। তারও সংখ্যারও ফৌজ লম্বা লাইন জুড়ে দাঁড়ায়। পরমাণুর অতি সূক্ষ্ম আকাশে যে দূরত্ব বাঁচিয়ে অতিপরমাণুরা চলাফেরা করে তার উপমা উপলক্ষে একজন বিখ্যাত জ্যোতিষী বলেছেন, হাওড়া স্টেশনের মতো মস্ত একটা স্টেশন থেকে অন্য সব-কিছু জিনিস সরিয়ে দিয়ে কেবল গোটা পাঁচ-ছয় বোলতা ছেড়ে দিলে তবে তারই সঙ্গে তুলনা হতে পারে পরমাণু আকাশস্থিত অতিপরমাণুদের। কিন্তু এই ব্যাপক শূণ্যের মধ্যে দূরবর্তী কয়েকটি চঞ্চল পদার্থকে আটকে রাখবার জন্যে পরমাণুর কেন্দ্রবস্তুর প্রায় সমস্ত ভার সমস্ত শক্তি কাজ করছে। এ না হলে পরমাণুজগৎ ছারখার হয়ে যেত, আর পরমাণু দিয়ে গড়া বিশ্বজগতের অস্তিত্ব থাকত না।

পদার্থের মধ্যে অণুগুলি পরস্পর কাছাকাছি আছে একটা টানের শক্তিতে। তবু সোনার মতো নিরেট জিনিসের অণুরও মাঝে মাঝে ফাঁক আছে। সংখ্যা দিয়ে সেই অতি সূক্ষ্ম ফাঁকের পরিমাণ জানাতে চাই নে, তাতে মন পীড়িত হবে। প্রশ্ন ওঠে একটুও ফাঁক থাকে কেন, গ্যাস থাকে কেন, কেন থাকে তরল পদার্থ। এর একই জাতের প্রশ্ন হচ্ছে পৃথিবী কেন সূর্যের গায়ে গিয়ে এঁটে যায় না। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটা পিণ্ডে তাল পাকিয়ে যায় না কেন। এর উত্তর এই পৃথিবী সূর্যের টান মেনেও দৌড়ের বেগে তফাত থাকতে পারে। দৌড় যদি যথেষ্ট পরিমাণ বেশি হত তা হলে টানের বাঁধন ছিঁড়ে শূণ্যে বেরিয়ে

পড়ত, দৌড়ের বেগ যদি ক্লান্ত হত তা হলে সূর্য তাকে নিত আত্মসাৎ ক'রে। অণুদের মধ্যে ফাঁক থেকে যায় গতির বেগে, তাতেই বাঁধনের শক্তিকে ঠেলে রেখে দেয়। গ্যাসীয় পদার্থে গতির প্রাধান্য বেশি। অণুর দল এই অবস্থায় এত দ্রুতবেগে চলে যে তাদের পরস্পরের মিল ঘটবার অবকাশ থাকে না। মাঝে মাঝে তাদের সংঘাত হয় কিন্তু মুহূর্তেই আবার যায় সরে। তরল পদার্থে আণবিক আকর্ষণের শক্তি সামান্য বলেই চলন বেগের জন্যে তাদের মধ্যে অতিঘনিষ্ঠতার সুযোগ হয় না। নিরেট বস্তুতে বাঁধনের শক্তিটা অপেক্ষাকৃত প্রবল। তাতে অণুর দল সীমাবদ্ধ স্থানের ভিতর আটকা পড়ে থাকে। তাই ব'লে তারা যে শান্ত থাকে তা নয় তাদের মধ্যে কম্পন চলছেই কিন্তু তাদের স্বাধীনতার ক্ষেত্র অল্পপরিসর।

অণুদের মধ্যে এই চলন কাঁপন, এই হচ্ছে তাপ। অস্থিরতা যত বাড়ে গরম ততই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এদের একেবারে শান্ত করা সম্ভব হত যদি এদের তাপ তাপমানের শূণ্য অঙ্কের নীচে আরো ২৭৩ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড নামিয়ে দেওয়া হত।

এইবার হাইড্রজেন গ্যাসের পরমাণু মহলে দৃষ্টি দেওয়া যাক।

এর চেয়ে হালকা গ্যাস আর নেই। এর পরমাণুর কেন্দ্রে বিরাজ করছে একটিমাত্র বৈদ্যুতকণা যাকে বলে প্রোটন, আর তার টানে বাঁধা প'ড়ে চার দিকে ঘুরছে অন্য একটিমাত্র কণিকা যার নাম ইলেকট্রন। প্রোটন-কণায় যে বৈদ্যুতের প্রভাব সে পজিটিভধর্মী, আর ইলেকট্রন-কণা যে বৈদ্যুতের বাহন সে নেগেটিভধর্মী। নেগেটিভ ইলেকট্রন চটুল চঞ্চল, পজিটিভ প্রোটন রাশভারী। ইলেকট্রনের ওজনটা গণ্যের মধ্যেই নয়, পরমাণুর প্রায় সমস্ত ভার কেন্দ্রবস্তুতে হয়েছে জমা।

মোটের উপরে সব ইলেকট্রনই না-ধর্মী বটে, কিন্তু এমন একজাতের ইলেকট্রন ধরা পড়েছে যারা হাঁ-ধর্মী, অথচ ওজনে ইলেকট্রনেরই সমান। এদের নাম দেওয়া হয়েছে পজিট্রন।

কখনো কখনো দেখা গেছে বিশেষ হাইড্রজেনের পরমাণু সাধারণের চেয়ে ডবল ভারী। পরীক্ষায় বেরিয়ে পড়ল কেন্দ্রস্থলে প্রোটনের সঙ্গে আছে তার এক সহযোগী। পূর্বেই বলেছি প্রোটন হাঁ-ধর্মী। তার কেন্দ্রের শরিকটিকে পরখ করে দেখা গেল সে সাম্যধর্মী, হাঁ-ধর্মীও নয়, না-ধর্মীও নয়। অতএব সে বৈদ্যুতধর্মবর্জিত। সে আপন প্রোটন শরিকের সমান ওজনের, কিন্তু প্রোটন যেমন ক'রে ইলেকট্রনকে টানে এ তেমন টানতে পারে না, আবার প্রোটনকে ঠেলে ফেলবার চেষ্টাও তার নেই। এই কণার নাম দেওয়া হয়েছে ন্যুট্রন। এটি লক্ষ্য করে দেখা গিয়েছে অন্য জাতের বাটখারা দিয়ে পরমাণু যতই ভারী করা যাক ইলেকট্রনের উপরে সেই সাম্যধর্মীদের কোনো জোর খাটে না – একটি প্রোটন কেবল একটিমাত্র ইলেকট্রনকে শাসনে রাখে। পরমাণুকেন্দ্রে প্রোটনের সংখ্যা যে পরিমাণ বেশি হয় সেই পরিমাণ ইলেকট্রনকে তারা বশে রাখে। অক্সিজেন গ্যাসের পরমাণুকেন্দ্রে আছে আটটি প্রোটন, সঙ্গে থাকে আটটি ন্যুট্রন, তার প্রদক্ষিণকারী ইলেকট্রনের সংখ্যা ঠিক আটটি।

পজিটিভ নেগেটিভে যথাপরিমাণ মিলে যেখানে সন্ধি করে আছে সেখানে যদি কোনো উপায়ে গৃহবিচ্ছেদ ঘটানো যায়, গুটিকতক নেগেটিভকে দেওয়া যায় তফাত করে, তা হলে সেই জিনিসে বৈদ্যুতের পরিমাণের হিসাবে হবে গরমিল, অতিরিক্ত হয়ে পড়বে পজিটিভ বৈদ্যুতের চার্জ। মেয়েপুরুষে মিলে যেখানে গৃহস্থালীর সামঞ্জস্য যেখানে মেয়ের প্রভাবকে যে-পরিমাণে সরিয়ে দেওয়া যাবে, সে-সংসারটা সেই পরিমাণে হয়ে পড়বে পুরুষপ্রধান; এও তেমনি।

এই চার্জ কথাটা ইলেকট্রিসিটির প্রসঙ্গে সর্বদাই ব্যবহারে লাগে। সাধারণত যে-সব জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করি তাদের মধ্যে বৈদ্যুতের কোনো ছটফটানি দেখা যায় না, তারা চার্জ করা নয়, অর্থাৎ দুই জাতের যে-পরিমাণ বৈদ্যুতে মিলে মিশে থাকলে শান্তি রক্ষা হয় তা তাদের মধ্যে আছে। কিন্তু কোনো জিনিসে কোনো একটা জাতের বৈদ্যুত

যদি সন্ধি না মেনে আপন নির্দিষ্ট পরিমাণ ছাপিয়ে বাড়াবাড়ি করে তা হলে সেই বৈদ্যুতের দ্বারা জিনিসটা চার্জ করা হয়েছে বলা হয়।

এক টুকরো রেশম নিয়ে কাঁচের গায়ে ঘষা গেল। ফল হল এই যে ঘষড়ানিতে কাঁচের থেকে কিছু ইলেকট্রন এল বেরিয়ে, সেটা চালান হল রেশমে। কাঁচে নেগেটিভ কমতেই পজিটিভ বৈদ্যুতের প্রাধান্য হল, ওদিকে রেশমে নেগেটিভ বৈদ্যুতের প্রভাব বাড়ল, সেটা হল নেগেটিভ বৈদ্যুতের দ্বারা চার্জ করা। ইলেকট্রন-খোয়ানো কাঁচ তার পজিটিভ চার্জের ঝোঁকে টেনে নিতে চাইল রেশমটাকে, আবার নেগেটিভের ভিড়-বাহুল্যওয়ালা রেশমে টান পড়ল কাঁচের দিকে। কাঁচ বা রেশমে সাধারণতন্ত্র যখন অক্ষুণ্ন ছিল তখন আপনাতে আপনি ছিল সহজ, ছিল শান্ত। শান্ত অবস্থায় এদের মধ্যে বৈদ্যুতের অস্তিত্ব জানাই যায় নি। বাইরে বৈদ্যুতিক গৃহবিপ্লবের খবর তখনই বেরিয়ে পড়ল যেমনি ভাগাভাগি অসমানতায় ক্ষোভ জন্মিয়ে দিলে।

কাঁচ কিংবা অন্য কিছুর থেকে ঘষাঘষির দ্বারা সামান্য পরিমাণ ইলেকট্রন সরিয়ে নেবার কথা বলেছি। পরিমাণটা কত যদি বিজ্ঞানীকে জিজ্ঞাসা করা যায় তিনি সামান্য একটু ঘাড় নেড়ে বলবেন, ঘষড়ানির মাত্রা অনুসারে চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট কোটি হতে পারে। বিজলি বাতির সল্‌তে-তারের ভিতর দিয়ে ইলেকট্রনের ঠেসাঠেসি ভিড় চলতে থাকে,তবেই সে জ্বলে। তারে এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে যতগুলি ইলেকট্রন একসঙ্গে যাত্রা করে আমাদের গণিতশাস্ত্রে সেই সংখ্যার কী নাম আছে আমি তা তো জানি নে। যা হোক এটা দেখা গেল যে, অতিপরমাণুদের দুরন্ত চাঞ্চল্য পজিটিভ নেগেটিভে সন্ধি করে সংযত হয়ে আছে তাই বিশ্বে আছে শান্তি। ভালুকওয়ালা বাজায় ডুগডুগি, তারই তালে ভাউক নাচে, আর নানা খেলা দেখায়। ডুগডুগিওয়ালা না যদি থাকে, পোষমানা ভালুক যদি শিকল কেটে স্বধর্ম পায় তাহলে কামড়িয়ে আঁচড়িয়ে চার দিকে অনর্থপাত করতে থাকে। আমাদের সর্বাঙ্গে এবং দেহের বাইরে এই পোষমানা বিভীষিকা নিয়ে অদৃশ্য ডুগডুগির ছন্দে চলেছে সৃষ্টির নাচ ও খেলা। সৃষ্টির আখড়ায় দুই খেলোয়াড় তাদের ভীষণ দ্বন্দ্ব মিলিয়ে বিশ্বচরাচরের রঙ্গভূমি সরগরম করে রেখেছে।

কোনো কোনো বিজ্ঞানী পরমাণুজগৎকে সৌরমণ্ডলীর সঙ্গে তুলনীয় করে বললেন, পরমাণুর কেন্দ্র ঘিরে ভিন্ন ভিন্ন চক্রপথে ঘুর খাচ্ছে ইলেকট্রনের দল। আর-এক পণ্ডিত প্রমাণ করলেন যে, ঘুর্ণিপাক-খাওয়া ইলেকট্রনরা তাদের এক কক্ষপথ থেকে আর-এক কক্ষপথে ঠাঁই বদল করে, আবার ফেরে আপন নির্দিষ্ট পথে।

পরমাণুলোকের যে-ছবি সৌরলোকের ছাঁদে, তাতে আছে পজিটিভ বৈদ্যুতওয়ালা একটা কেন্দ্রবস্তু, আর তার চার দিকে ইলেকট্রনদের প্রদক্ষিণ।

এ মত মেনে নেবার বাধা আছে। ইলেকট্রন যদি একটানা পথে চলত তা হলে ক্রমে তার শক্তি ক্ষয় হয়ে ক্রমে পথ খাটো করে সে পড়ত গিয়ে কেন্দ্রবস্তুর উপরে। পরমাণুর সর্বনাশ ঘটাত।

এখন এই মত দাঁড়িয়েছে, ইলেকট্রনের ডিম্বাকার চলবার পথ একটি নয়, একাধিক। কেন্দ্র থেকে এই কক্ষগুলির দূরত্ব নির্দিষ্ট। কেন্দ্রের সব চেয়ে কাছের যে পথ, কোনো ইলেকট্রন তা পেরিয়ে যেতে পারে না। ইলেকট্রন বাইরের পথ থেকে ভিতরের পথে দর্শন দেয়। কেন দেয় এবং হঠাৎ কখন দেখা দেবে তার কোনো বাঁধা নিয়ম পাওয়া যায় না। তেজ শোষণ ক'রে ইলেকট্রন ভিতরের পথ থেকে বাইরের পথে লাফিয়ে যায়, এই লাফের মাত্রা নির্ভর করে শোষিত তেজের পরিমাণের উপর। ইলেকট্রন তেজ বিকীর্ণ করে কেবল যখন সে তার বাইরের পথ থেকে ভিতরের পথে আবির্ভূত হয়। ছাড়া-পাওয়া এই তেজকেই আমরা পাই অলোরূপে। যতক্ষণ একই কক্ষে চলতে থাকে ততক্ষণ তার শক্তি-বিকিরণ বন্ধ। এ মতটা ধরে-নেওয়া একটা মত, কোনো কারণ দেখানো যায় না। মতটা মেনে নিলে তবেই বোঝা যায় পরমাণু কেন টিঁকে আছে, বিশ্ব কেন বিলুপ্ত হয়ে যায় নি।

এ-সব কথার পিছনে দুরূহ তত্ত্ব আছে, সেটা বোঝবার অনেক দেরি। আপাতত কথাটা শুনে রাখা মাত্র।

পূর্বেই বলেছি বিজ্ঞানীরা খুব দৃঢ়স্বরে ঘোষণা করেছিলেন যে, বিরেনব্বইটি আদিভূত বিশ্বসৃষ্টির মৌলিক পদার্থ। অতিপরমাণুদের সাক্ষ্যে আজ সে কথা অপ্রমাণ হয়ে গেল। তবু এখনো রয়ে গেল এদের সম্মানের উপাধিটা।

একদা মৌলিক পদার্থের খ্যাতি ছিল যে তাদের গুণের নিত্যতা আছে। তাদের যতই ভাঙা যাক কিছুতেই তাদের স্বভাবের বদল হয় না। বিজ্ঞানের প্রথম অধ্যয়ে দেখা গেল তাদের চরম ভাগ করলে বেরিয়ে পড়ে দুই জাতীয় বৈদ্যুতওয়ালা কণাবস্তুর জুড়িনৃত্য। যারা মৌলিক পদার্থ নামধারী তাদের স্বভাবের বিশেষত্ব রক্ষা করেছে এই-সব বৈদ্যুতেরা বিশেষ সংখ্যায় একত্র হয়ে। এইখানেই যদি থামত তা হলেও পরমাণুদের রূপনিত্যতার খ্যাতি টিঁকে যেত। কিন্তু ওদের নিজের দলের থেকেই বিরুদ্ধে সাক্ষ্য পাওয়া গেল। একটা খবর পাওয়া গেল যে, হালকা যে-সব পরমাণু তাদের মধ্যে ইলেকট্রন প্রোটনের ঘোরাঘুরি নিত্যনিয়মিতভাবে চলে আসছে বটে কিন্তু অত্যন্ত ভারী যারা, যাদের মধ্যে ন্যুট্রন-প্রোট্রনসংঘের অতিরিক্ত ঠেসাঠেসি ভিড়, যেমন য়ুরেনিয়ম বা রেডিয়ম, তারা আপন তহবিল সামলাতে পারছে না, সদা সর্বক্ষণই তাদের মূল সম্বল ছিটকে পড়তে পড়তে হালকা হয়ে তারা এক রূপ থেকে অন্য রূপ ধরছে।

এতকাল রেডিয়ম নামক এক মৌলিক নামক এক মৌলিক ধাতু লুকিয়ে ছিল স্থূল আবরণের মধ্যে। তার আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে পরমাণুর গূঢ়তম রহস্য ধরা পড়ে গেল। বিজ্ঞানীদের সঙ্গে তার প্রথম মোকাবিলার ইতিহাস মনে রেখে দেবার যোগ্য।

যখন র‍্যন্টগেন রশ্মির আবিষ্কার হল, দেখা গেল তার স্থূল বাধা ভেদ করবার ক্ষমতা। তখন আঁরি বেকরেল ছিলেন প্যারিস ম্যুনিসিপাল স্কুলে বিজ্ঞানের অধ্যাপক। স্বতোদীপ্তিমান পদার্থ মাত্রেরই এই বাধা ভেদ করবার শক্তি আছে কি না, সেই পরীক্ষায় তিনি লাগলেন। এইরকম কতকগুলি ধাতুপদার্থ নিয়ে কাজ আরম্ভ করে দিলেন। তাদের কালো কাগজে মুড়ে রেখে দিলেন ফোটোগ্রাফের প্লেটের উপরে। দেখলেন তাতে মোড়ক

ভেদ করে কেবল য়ুরেনিয়ম ধাতুরই চিহ্ন পড়ল। সকলের চেয়ে গুরুভার যার পরমাণু তার তেজস্ক্রিয়তা সপ্রমাণ হয়ে গেল।

পিচব্লেণ্ড নামক এক খনিজ পদার্থ থেকে য়ুরেনিয়মকে ছিনিয়ে নেওয়া থাকে। বেকরেলের এক অসামান্য বুদ্ধিদীপ্ত ছাত্রী ছিলেন মাদাম কুরি। তাঁর স্বামী পিয়ের কুরি ফরাসী বিজ্ঞানী বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁরা স্বামীস্ত্রীতে মিলে এই পিচব্লেণ্ড নিয়ে পরখ করতে লাগলেন, দেখলেন এর তেজস্ক্রিয় প্রভাব য়ুরেনিয়মের চেয়ে আরো প্রবল। পিচব্লেণ্ডের মধ্যে এমন কোনো কোনো পদার্থ আছে যারা এই শক্তির মূলে, তারই আবিষ্কারের চেষ্টায় তিনটি নূতন পদার্থ বের হল, রেডিয়ম, পলোনিয়ম, এবং অ্যাক্‌টিনিয়ম।

পরীক্ষা করতে করতে প্রায় চল্লিশটি তেজস্ক্রিয় পদার্থ পাওয়া গেছে। প্রায় এদের সবগুলিই বিজ্ঞানে নতুন জানা।

তখনকার দিনে সকলের চেয়ে চমক লাগিয়ে দিল এই ধাতুর একটি অদ্ভুত স্বভাব। সে নিজের মধ্যে থেকে জ্যোতিষ্কণা বিকীর্ণ ক'রে নিজেকে নানা মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত করতে করতে অবশেষে সীসে করে তোলে। এ যেন একটা বৈজ্ঞানিক ভেলকি বললেই হয়। এক ধাতু থেকে অন্য ধাতুর যে উদ্ভব হতে পারে, সে এই প্রথম জানা গেল।

যে-সকল পদার্থ রেডিয়মের এক জাতের, অর্থাৎ তেজ-ছিটোনোই যাদের স্বভাব তারা সকলেই জাত-খোয়াবার দলে। তারা কেবলই আপনার তেজের মূলধন খরচ করতে থাকে। এই অপব্যয়ের ফর্দে প্রথম যে তেজঃপদার্থ পড়ে, গ্রীকবর্ণমালার প্রথম অক্ষরের নামে তার নাম দেওয়া হয়েছে আল্‌ফা। বাংলা বর্ণমালা ধরে তাকে ক বললেই চলে। এ একটা পরমাণু, পজিটিভ জাতের। রেডিয়মের আরো একটা ছিটিয়ে-ফেলা তেজের কণা আছে, তার নাম দেওয়া হয়েছে বীটা, বলা যেতে পারে খ। সে ইলেকট্রন, নেগেটিভ চার্জ

করা, বিষম তার দ্রুত বেগ। তবু পাতলা একটি কাগজ চলার রাস্তায় পড়লে আল্‌ফা-পরমাণু দেহান্তর লাভ করে, সে হয়ে যায় হীলিয়ম গ্যাস। আরো কিছু বাধা লাগে বীটাকে থামিয়ে দিতে। রেডিয়মের তূণে এই দুইটি ছাড়া আর-একটি রশ্মি আছে তার নাম গামা। সে পরমাণু বা অতিপরমাণু নয়, সে একটি বিশেষ আলোকরশ্মি। তার কিরণ স্থুল বস্তুকে ভেদ করে যেতে পারে, যেমন যায় র‍্যন্টগেন রশ্মি। এই সব তেজকণার ব্যবহার সকল অবস্থাতেই সমান, লোহা-গলানো গরমেও, গ্যাস-তরল-করা ঠাণ্ডাতেও। তা ছাড়া তাদের ফিরিয়ে নিয়ে আবার পূর্বের মতো দানা বেঁধে দেওয়া কারো সাধ্য নেই।

পরমাণুর কেন্দ্র-পিণ্ডটিকে যতক্ষণ-না কোনো লোকসান ঘটে ততক্ষণ দুটো-চারটে ইলেকট্রন যদি ছিনিয়ে নেওয়া যায় তা হলে তার বৈদ্যুতের বাঁধা বরাদ্দে কিছু কমতি পড়তে পারে কিন্তু অপঘাতটা সাংঘাতিক হয় না। যদি ঐ কেন্দ্রবস্তুটার খাস তহবিলে লুটপাট সম্ভব হয় তা হলেই পরমাণুর জাত বদল হয়ে যায়।

পরমাণুর নিজের একান্ত ঐক্য নেই এ-খবরটা পেয়েই বিজ্ঞানীরা প্রথমটা আশা করেছিলেন যে, তাঁরা তেজ-ছুঁড়ে মারা গোলন্দাজ রেডিয়মকে লাগাবেন পরমাণুর মধ্যে ভেদ ঘটিয়ে তার কেন্দ্রসম্বলভাঙা লুটপাটের কাজে। কিন্তু লক্ষ্যটি অতিসূক্ষ্ম, নিশানা করা সহজ নয়, তেজের ঢেলা বিস্তর মারতে মারতে দৈবাৎ একটা লেগে যায়। তাই এরকম অনিশ্চিত লড়াই-প্রণালীর বদলে আজকাল প্রকাণ্ড যন্ত্র তৈরির আয়োজন হচ্ছে যাতে অতি প্রচণ্ড শক্তিমান বৈদ্যুত উৎপন্ন হয়ে পরমাণুর কেন্দ্রকেল্লার পাহারা ভেদ করতে পারে। সেখানে আছে প্রবল পালোয়ান-শক্তির পাহারা। আজ ঠিক যে-সময়টাতে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারবার জন্যে সহস্রঘ্নী যন্ত্রের উদ্ভাবন হচ্ছে ঠিক সেই সময়টাতেই বিশ্বের সূক্ষ্মতম পদার্থের অলক্ষ্যতম মর্ম বিদীর্ণ করবার জন্যে বিরাট বৈদ্যুতবর্ষণীর কারখানা বসল।

পূর্বেই বলেছি আল্‌ফাকণা স্বরূপ হারিয়ে হয়ে যায় হীলিয়ম গ্যাস। এটা কাজে লেগেছে পৃথিবীর বয়স প্রমাণ করতে। কোনো পাহাড়ের একখানা পাথরের মধ্যে যদি বিশেষ পরিমাণ হীলিয়ম গ্যাস দেখা যায়, তা হলে এই গ্যাসের পরিণতির নির্দিষ্ট সময়

হিসাব করে ঐ পাহাড়ের জন্মকুষ্ঠি তৈরি করা যায়। এই প্রণালীর ভিতর দিয়ে পৃথিবীর বয়স বিচার করা হয়েছে।

ওজনের গুরুত্বে হাইড্রজেন গ্যাসের ঠিক উপরের কোঠাতেই পড়ে যে-গ্যাস তারই নাম দেওয়া হয়েছে হীলিয়ম। এই গ্যাস বিজ্ঞানীমহলে নূতন-জানা। এই গ্যাস প্রথম ধরা পড়েছিল সূর্যগ্রহণের সময়ে। সূর্য আপন চক্রসীমাটুকু ছাড়িয়ে বহুলক্ষ ক্রোশ দূর পর্যন্ত জলদ্‌বাষ্পের অতি সূক্ষ্ম উত্তরীয় উড়িয়ে থাকে, ঝরনা যেমন জলকণার কুয়াশা ছড়ায় আপনার চারি দিকে। গ্রহণের সময় সেই তার চার দিকের আগ্নেয় গ্যাসের বিস্তার দেখতে পাওয়া যায় দুরবীনে। এই দূরবিক্ষিপ্ত গ্যাসের দীপ্তিকে য়ুরোপীয় ভাষায় বলে করোনা, বাংলায় একে বলা যেতে পারে কিরীটিকা।

কিছুকাল আগে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের সূর্যগ্রহণের সুযোগে এই কিরীটিকা পরীক্ষা করবার সময় বর্ণলিপির নীলসীমানার দিকে দেখা গেল তিনটি অজানা সাদা রেখা। পণ্ডিতেরা ভাবলেন হয়তো কোনো একটি আগের জানা পদার্থ অধিক দহনে নূতন দশা পেয়েছে, এটা তারই চিহ্ন। কিংবা হয়তো একটা নতুন পদার্থই বা জানান দিল। এখনো তার ঠিকানা হল না।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের গ্রহণের সময় বিজ্ঞানীদের এইরকমই একটা চমক লাগিয়েছিল। সূর্যের গ্যাসীয় বেড়ার ভিতর থেকে একটা লিপি এল তখনকার কোনো অচেনা পদার্থের। এই নূতন খবর-পাওয়া মৌলিক পদার্থের নাম দেওয়া হল হীলিয়ম, অর্থাৎ সৌরক। কেননা তখন মনে হয়েছিল এটা একান্ত সূর্যেরই অন্তর্গত গ্যাস। অবশেষে ত্রিশ বছর কেটে গেলে পরে বিখ্যাত রসায়নী র‍্যামজে এই গ্যাসের আমেজ পেলেন পৃথিবীর হাওয়ায় অতি সামান্য পরিমাণে। তখন স্থির হল পৃথিবীতে এ গ্যাস দুর্লভ। তার পরে দেখা গেল উত্তর-আমেরিকায় কোনো মেটে তেলের গহ্বরে যে-গ্যাস পাওয়া যায় তাতে যথেষ্ট পরিমাণে হীলিয়ম আছে। তখন একে কাজে লাগাবার সুবিধে হল। অত্যন্ত হালকা ব’লে এতদিন হাইড্রেজেন গ্যাস দিয়ে আকাশযানগুলোর উড়ন-শক্তির জোগান দেওয়া হত।

কিন্তু হাইড্রেজেন গ্যাস ওড়াবার পক্ষে যেমন কেজো, জ্বালাবার পক্ষে তার চেয়ে কম না। এই গ্যাস অনেক মস্ত মস্ত উড়োজাহাজকে জ্বালিয়ে মেরেছে। হীলিয়ম গ্যাসের মধ্যে প্রচ্ছন্ন দুরন্ত জ্বলনচণ্ডী নেই, অথচ হাইড্রেজেন ছাড়া সকল গ্যাসের চেয়ে এ হালকা। তাই জাহাজ-ওড়ানোকে নিরাপদ করবার জন্যে তারই ব্যবহার চলতি হয়েছে। চিকিৎসাতেও কোনো কোনো রোগে এর প্রয়োগ শুরু হল।

পূর্বেই বলা হয়েছে পজিটিভ চার্জওয়ালা পদার্থ ও নেগেটিভ চার্জওয়ালা পদার্থ পরস্পরকে কাছে টানে কিন্তু একই জাতীয় চার্জওয়ালারা পরস্পরকে ঠেলে ফেলতে চায়। যতই তাদের কাছাকাছি করা যায় ততই উগ্র হয়ে ওঠে তাদের ঠেলার জোর। তেমনি বিপরীত চার্জওয়ালারা যতই পরস্পরের কাছে আসে তাদের টানের জোর ততই বেড়ে ওঠে। এইজন্যে যে-সব ইলেকট্রন কেন্দ্রবস্তুর কাছাকাছি থাকে তারা টানের জোর এড়াবার জন্যে দূরবর্তীদের চেয়ে দৌড়য় বেশি জোরে। সৌরমণ্ডলে যে-সব গ্রহ সূর্যের যত কাছে তাদের দৌড়ের বেগ ততই বেশি; দূরের গ্রহদের বিপদ কম, তারা অনেকটা ধীরেসুস্থে চলে।

এই ইলেকট্রন প্রোটনের ব্যাস সমস্ত পরমাণুর পঞ্চাশ হাজার ভাগের এক ভাগ। অর্থাৎ পরমাণুর মধ্যে শূণ্যতাই বেশি। একটা মানুষের দেহের সমস্ত পরমাণু যদি ঠেসে দেওয়া হয়, তা হলে তার থেকে একটা অদৃশ্যপ্রায় বস্তুবিন্দু তৈরি হবে।

দুই প্রোটনের পরস্পরের প্রতি বিমুখতার জোর যে কত, রসায়নী ফ্রেডরিক সডি তার হিসাব করে বলেছেন, এক গ্রাম পরিমাণ প্রোটন যদি ভূতলের এক মেরুতে রাখা যায় আর তার বিপরীত মেরুতে থাকে আর এক গ্রাম প্রোটন তা হলে এই সুদূর পথ পেরিয়ে তাদের উভয়েরই ঠেলা মারার জোর হবে প্রায় ছ শো মণের চাপে। এই যদি বিধি হয় তা হলে বোঝা শক্ত হয় পরমাণুকেন্দ্রের অতি সংকীর্ণ মণ্ডলীর মধ্যে একটির বেশি প্রোটন কেমন করে ঘেঁষাঘেঁষি মিলে থাকতে পারে। এই নিয়ম অনুসারে হাইড্রজেন

যার পরমাণুকেন্দ্রে একেশ্বর প্রোটনের অধিকার, সে ছাড়া বিশ্বে আর কোনো পদার্থ তো টিঁকতেই পারে না; তা হলে তো বিশ্বজগৎ হয়ে ওঠে হাইড্রজেনময়।

এদিকে দেখা যায় য়ুরেনিয়ম ধাতু বহন করেছে ৯২টা প্রোটন, ১৪৬টা ন্যুট্রন। এত বেশি ভিড় সে সামলাতে পারে না এ কথা সত্য, ক্ষণে ক্ষণে সে তার কেন্দ্রভাণ্ডার থেকে বৈদ্যুতকণার বোঝা হালকা করতে থাকে। ভার কিছু পরিমাণ কমলে সে রূপ নেয় রেডিয়মের, আরো কমলে হয় পলোনিয়ম, অবশেষে সীসের রূপ ধরে স্থিতি পায়।

ওজন এত ছেঁটে ফেলেও স্থিতি পায় কী করে এ সন্দেহ তো দূর হয় না। বিকিরণের পালা শেষ করে সমস্ত বাদসাদ দিয়েও সীসের দখলে বাকি থাকে ৮২টা প্রোটন। পজিটিভ বৈদ্যুতের স্বজাত-ঠেলা-মারা মেজাজ নিয়ে এই প্রোটনগুলো পরমাণুলোকের শান্তিরক্ষা করে কী ক'রে, দীর্ঘকাল ধরে এ প্রশ্নের ভালো জবাব পাওয়া গেল না। কেন্দ্রের বাইরে ঝগড়া মেটে না, কেন্দ্রের ভিতরটাতে এদের মৈত্রী অটুট, এ একটা বিষম সমস্যা।

এই রহস্যভেদের উপযোগী ক'রে যন্ত্রশক্তির বল বৃদ্ধি করা হল। পরমাণুর কেন্দ্রগত প্রোটন-লক্ষ্যের বিরুদ্ধে পরীক্ষকেরা হাঁ-ধর্মী বৈদ্যুতকণার দল লাগিয়ে দিলেন; যত জোরের বৈদ্যুতকণা তাদের ধাক্কা দিলে তার বেগ সেকেণ্ডে ৬৭২০ মাইল। তবু কেন্দ্রস্থিত প্রোটন আপন প্রোটনধর্ম রক্ষা করলে, আক্রমণকারী বৈদ্যুতের দলকে ছিটকিয়ে ফেললে। বৈদ্যুত তাড়নার জোর বাড়িয়ে দেওয়া হল। বিজ্ঞানী লাগালেন ধাক্কা ৭৭০০ মাইলের বেগে, শিকারটিকে হার মানাতে পারলেন না। অবশেষে ৮২০০ মাইলের তাড়া খেয়ে বিরুদ্ধশক্তি নরম হবার লক্ষণ দেখালে। ছিটকানো-শক্তির বেড়া ডিঙিয়ে আক্রমণশক্তি পৌঁছল কেন্দ্রদুর্গের মধ্যে। দেখা গেল দুটি সমধর্মী বৈদ্যুতকণা যত কাছে গিয়ে পৌঁছলে তাদের ঠেলাঠেলি যায় চুকে সে হচ্ছে এক ইঞ্চির বহু কোটি ভাগ ঘেঁষাঘেঁষিতে। তা হলে ধরে নিতে হবে ঐ নৈকট্যের মধ্যে প্রোটনের পরস্পর ঠেলে ফেলার শক্তি যত তার চেয়ে প্রভূত বড়ো একটা শক্তি আছে, টেনে রাখবার শক্তি। ঐ শক্তি পরমাণুমহলে প্রোটনকেও যেমন টানে ন্যুট্রনকেও তেমনি টানে, অর্থাৎ বৈদ্যুতের চার্জ যার আছে আর যার নেই

উভয়ের ‘পরেই তার সমান প্রভাব। পরমাণুকেন্দ্রবাসী এই অতিপ্রবল আকর্ষণশক্তি সমস্ত বিশ্বকে রেখেছে বেঁধে। পরমাণুর মধ্যেকার ঘরোয়া বিবাদ মিটিয়েছে যে-শাসন সেই শাসনেই বিশ্বে বিরাজ করে শান্তি।

আধুনিক ইতিহাস থেকে এর উপমা সংগ্রহ করে দেওয়া যাক। চীন রিপব্লিকের শান্তি নষ্ট ক’রে কতকগুলি একাধিপত্যলোলুপ জাঁদরেল পরস্পর লড়াই ক’রে দেশটাকে ছারখার করে দিচ্ছিল। রাষ্ট্রের কেন্দ্রস্থলে এই বিরুদ্ধদলের চেয়ে প্রবলতর শক্তি যদি থাকত তা হলে শাসনের কাজে এদের সকলকে এক ক’রে রাষ্ট্রশক্তিকে বলিষ্ঠ ও নিরাপদ করে রাখা সহজ হত। পরমাণুর রাষ্ট্রতন্ত্রে সেই বড়ো শক্তি আছে সকল শক্তির উপরে, তাই যারা স্বভাবত মেলে না তারাও মিলে বিশ্বের শান্তি রক্ষা হচ্ছে। এর থেকে দেখতে পাচ্ছি বিশ্বের শান্তি পদার্থটি ভালোমানুষি শান্তি নয়। যত-সব দুরন্তদের মিলিয়ে নিয়ে তবে একটা প্রবল মিল হয়েছে। যারা স্বতন্ত্রভাবে সর্বনেশে তারাই মিলিতভাবে সৃষ্টির বাহন।

পরমাণুর ইতিহাসে রেডিয়মের অধ্যায়ের মূল্য বেশি, সেইজন্যে একটু বিশদ করে তার কথাটা বলে নিই। – রেডিয়ম লোহা প্রভৃতির মতোই ধাতুদ্রব্য। এর পরমাণুগুলি ভারে এবং আয়তনে বড়ো। অবশেষে একদিন কী কারণে কেউ জানে না রেডিয়মের পরমাণু যায় ফেটে, তার অল্প একটু অংশ যায় ছুটে; এই ভাঙন-ধরা পরমাণু থেকে নিঃসৃত আল্‌ফারশ্মিতে যে কণিকাগুলি প্রবাহিত হয় তারা প্রত্যেকে দুটি প্রোটন ও দুটি ন্যুট্রনের সংযোগে তৈরি। অর্থাৎ হীলিয়ম পরমাণুর কেন্দ্রবস্তুরই সঙ্গে তার এক। বীটারশ্মি কেবল ইলেকট্রনের ধারা। গামারশ্মিতে কণা নেই; তা আলোকজাতীয়। কেন যে এমন ভাঙচুর হয় তার কারণ আজও ধরা পড়ে নি। এইটুকু অপব্যয়ের দরুন পরমাণুর বাকি অংশ আর সেই সাবেক রেডিয়মরূপে থাকে না। তার স্বভাব যায় বদলিয়ে। দুটি ইলেকট্রন আত্মসাৎ করে আল্‌ফাকণার পরিণতি ঘটে হীলিয়ম গ্যাসে। এই স্ফোরণ ব্যাপারকে বাইরের কিছুতে না পারে উসকিয়ে দিতে, না পারে থামাতে। চারি দিকের অবস্থা ঠাণ্ডাই থাক্ আর গরমই থাক্, অন্য অণুপরমাণুদের সঙ্গে মেলামেশাই করুক, অর্থাৎ তার

বাইরের ব্যবস্থা যে-রকমই হোক তার ফেটে যাওয়ার কাজটা ঘটতে থাকে ভিতরের থেকে। গড়ের উপরে রেডিয়মের আয়ু প্রায় দু হাজার বছর, কিন্তু তার যে-পরমাণু থেকে একটা আল্‌ফাকণা ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে তার মেয়াদ প্রায় দিন-চারেকের। তার পরে তার থেকে পরে পরে স্ফোরণ ঘটতে থাকে, অবশেষে গিয়ে ঠেকে সীসেতে। আল্‌ফাকণা যখন শুরু করে তার দৌড় তখন তার বেগ থাকে এক সেকেণ্ডে প্রায় দশ হাজার মাইল। কিন্তু যখন তাকে কোনো বস্তুপদার্থের, এমন-কি, বাতাসের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় তখন দু-তিন ইঞ্চিখানেক পথ যেতে যেতেই তার চলন সহজ হয়ে আসে। আল্‌ফারশ্মি চলে একেবারে সোজা রেখা ধ'রে। কী ক'রে পারে সে একটা ভাববার কথা। কেননা বাতাসে যে অক্সিজেন বা নাইট্রেজেন পরমাণু আছে হীলিয়মের পরমাণু তার চেয়ে অনেক হালকা আর ছোটো। এই তিন ইঞ্চি রাস্তায় বাতাসের বিস্তর ভারী ভারী অণু তাকে ঠেলে যেতে হয়। এ কিন্তু ভিড় ঠেলে যাওয়া নয়, ভিড় ভেদ করে যাওয়া। পরমাণু বলতে বোঝায় একটি কেন্দ্রবস্তু আর তাকে ঘিরে দৌড়-খাওয়া ইলেকট্রনের দল। এদের পাহারার ভিতর দিয়ে যেতে প্রচণ্ড বেগের জোর চাই। সেই জোর আছে আল্‌ফাকণার। সে অন্য মণ্ডলীর ভিতর দিয়ে চলে যায়। অন্য পরমাণুর ভিতর দিয়ে যেতে যেতে লোকসান ঘটাতে থাকে। কোনো পরমাণু দিলে হয়তো একটা ইলেকট্রন সরিয়ে, ক্রমে দুটো-তিনটে গেল হয়তো তার খসে, তখন ইলেকট্রনগুলো বাঁধনছাড়া হয়ে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। অন্য পরমাণুদের সঙ্গে জোড় বাঁধে। যে-পরমাণু ইলেকট্রন হারিয়েছে তাকে লাগে পজিটিভ বৈদ্যুতের চার্জ আর যে-পরমাণু ছাড়া-ইলেকট্রনটাকে ধরেছে তার চার্জ নেগেটিভ বৈদ্যুতের। তারা যদি পরস্পরের যথেষ্ট কাছাকাছি আসে তা হলে আবার হিসেব সমান করে নেয়। অসাম্য ঘুচলে তখন বৈদ্যুতধর্মের চাঞ্চল্য শান্ত হয়ে যায়। স্বভাবত হীলিময় পরমাণুর থাকে দুটো ইলেকট্রন। কিন্তু রেডিয়ম থেকে আল্‌ফাকণারূপে নিঃসৃত হয়ে সে যখন অন্য বস্তুর মধ্যে দিয়ে ছুটতে থাকে তখনকার মতো তার সঙ্গী দুটো যায় ছিন্ন হয়ে। অবশেষে উপদ্রবের অন্ত হলে ছুটো ইলেকট্রনদের মধ্যে থেকে অভাব পূরণ করে নিয়ে স্বধর্মে ফিরে আসে।

এইখানে আর-একটা কথা বলে এই প্রসঙ্গে শেষ করে দেওয়া যাক। সকল বস্তুরই পরমাণুর ইলেকট্রন প্রোটন ও ন্যুট্রন একই পদার্থ। তাদেরই ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে বস্তুর ভেদ। যে-পরমাণুর আছে মোট ছয়টা পজিটিভ চার্জ সেই হল কার্বনের অর্থাৎ আঙ্গারিক বস্তুর পরমাণু। সাততা ইলেকট্রনওয়ালা পরমাণু নাইট্রোজেনের, আটটা অক্সিজেনের। কেবল হাইড্রেজেন পরমাণুর আছে একটা ইলেকট্রন। আর বিরেনব্বইটা আছে য়ুরেনিয়মের। পরমাণুদের মধ্যে পজিটিভ চার্জের সংখ্যাভেদ নিয়েই তাদের জাতিভেদ। সৃষ্টির সমস্ত বৈচিত্র্যই সংখ্যার ছন্দে।

বৈদ্যুতসন্ধানীরা যখন আপন কাজে নিযুক্ত আছেন তখন তাদের হিসাবে গোলমাল বাধিয়ে দিয়ে অকস্মাৎ একটা অজানা শক্তির অস্তিত্ব ধরা দিল। তার বিকিরণকে নাম দেওয়া হল মহাজাগতিক রশ্মি; কস্‌মিক রশ্মি। বলা যেতে পারে আকস্মিক রশ্মি। কোথা থেকে আসছে বোঝা গেল না কিন্তু দেখা গেল সর্বত্রই। কোনো বস্তু বা কোনো জীব নেই যার উপরে এর করক্ষেপ চলছে না। এমন-কি; ধাতুদ্রব্যের পরমাণুগুলোকে ঘা মেরে উত্তেজিত করে দিচ্ছে। হয়তো এরা জীবের প্রাণশক্তির সাহায্য করছে, কিংবা বিনাশ করছে – কী করছে জানা নেই, আঘাত করছে এইটেই নিঃসংশয়।

এই যে ক্রমাগতই কস্‌মিকরশ্মি-বর্ষণ চলেছে এর উৎপত্তির রহস্য অজানা রয়ে গেল। কিন্তু জানা গেছে বিপুল এর উদ্যম, সমস্ত আকাশ জুড়ে এর সঞ্চরণ, জলে স্থলে আকাশে সকল পদার্থেই এর প্রবেশ; এই মহা আগন্তুকের পিছনে বিজ্ঞানের চর লেগেই আছে, কোন্‌ দিন গোপন ঠিকানা ধরা পড়বে।

অনেকে বলে কস্‌মিক আলো আলোই বটে, র‍্যন্টগেন রশ্মির চেয়ে বহুগুণে জোরালো। তাই এরা সহজে পুরু সীসে বা মোটা সোনার পাত পার হয়ে চলে যায়। বিজ্ঞানীদের পরীক্ষায় এটুকু জানা গেছে এই আলোর সঙ্গে আছে বৈদ্যুতকণা। পৃথিবীর যে ক্ষেত্রে চৌম্বকশক্তি বেশি এরা তারই টানে আপন পথ থেকে সরে গিয়ে মেরুপ্রদেশে

জমা হয়, তাই পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় কস্‌মিক রশ্মির সমাবেশের কমিবেশি দেখা যায়।

কস্‌মিক রশ্মির সম্বন্ধে এখনো নানা মতের আনাগোন চলেইছে। পরমাণুর নূতন তত্ত্বের সূত্রপাত হওয়ার পর থেকেই বিজ্ঞানমহলে মননের ও মতের তোলাপাড়ার অন্ত নেই, বিশ্বের মূল কারখানার ব্যবস্থায় ধ্রুবত্বের পাকা সংকেত খুঁজে বের করা অসাধ্য হল। নিত্য ব’লে যদি কিছু খ্যাতি পেতে পারে তবে সে কেবল এক আদিজ্যোতি, যা রয়েছে সব-কিছুরই ভূমিকায়, যার প্রকাশের নানা অবস্থান্তরের ভিতর দিয়ে গড়ে উঠেছে বিশ্বের এই বৈচিত্র্য।

নক্ষত্রলোক

এই তো দেখা গেল বিশ্বব্যাপী অরূপ বৈদ্যুতলোক। এদের সম্মিলনের দ্বারা প্রকাশবান রূপলোক গ্রহনক্ষত্রে।

গোড়াতেই বলে রাখি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আসল চেহারা কী জানবার জো নেই। বিশ্বপদার্থের নিতান্ত অল্পই আমাদের চোখে পড়ে। তা ছাড়া আমাদের চোখ কান স্পর্শেন্দ্রিয়ের নিজের বিশেষত্ব আছে। তাই বিশ্বের পদার্থগুলি বিশেষ ভাবে বিশেষ রূপে আমাদের কাছে দেখা দেয়। ঢেউ লাগে চোখে, দেখি আলো। আরো সূক্ষ্ম বা আরো স্থুল ঢেউ সম্বন্ধে আমরা কানা। দেখাটা নিতান্ত অল্প, না-দেখাটাই অত্যন্ত বেশি। পৃথিবীর কাজ চালাব বলেই সেই অনুযায়ী আমাদের চোখ কান, আমরা যে বিজ্ঞানী হব প্রকৃতি সে খেয়ালই করে নি। মানুষের চোখ অণুবীক্ষণ ও দুরবীন এই দুইয়ের কাজই সামান্য পরিমাণে করে থাকে। বোধের সীমা বাড়লে বা বোধের প্রকৃতি অন্যরকম হলে আমাদের জগৎটাও হত অন্যরকম।

বিজ্ঞানীর কাছে সেই অন্যরকমই তো হয়েছে। এতই অন্যরকমের যে, যে-ভাষায় আমরা কাজ চালাই এ জগতের পরিচয় তার অনেকখানিই কাজে লাগে না। প্রত্যহ এমন চিহ্নওয়ালা ভাষা তৈরি করতে হচ্ছে যে, সাধারণ মানুষ তার বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারে না।

একদিন মানুষ ঠিক করেছিল বিশ্বমণ্ডলের কেন্দ্রে পৃথিবীর আসন অবিচলিত, তাকে প্রদক্ষিণ করছে সূর্যনক্ষত্র। মনে যে করেছিল, সেজন্যে তাকে দোষ দেওয়া যায় না – সে দেখেছিল পৃথিবী-দেখা সহজ চোখে। আজ তার চোখ বেড়ে গেছে, বিশ্ব-দেখা চোখ বানিয়ে নিয়েছে। ধরে নিতে হয়েছে পৃথিবীকেই ছুটতে হয় সূর্যের চার দিকে, দরবেশী নাচের মতো পাক খেতে খেতে। পথ সুদীর্ঘ, লাগে ৩৬৫ দিনের কিছু বেশি। এর চেয়ে

বড়ো পথওয়ালা গ্রহ আছে, তারা ঘুরতে এত বেশি সময় নেয় যে ততদিন বেঁচে থাকতে গেলে মানুষের পরমায়ুর বছর বাড়াতে হবে।

রাত্রের আকাশে মাঝে মাঝে নক্ষত্রপুঞ্জের সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় লেপে দেওয়া আলো। তাদের নাম দেওয়া হয়েছে নীহারিকা। এদের মধ্যে কতকগুলি সুদূরবিস্তৃত অতি হালকা গ্যাসের মেঘ, আবার কতকগুলি নক্ষত্রের সমাবেশ। দুরবীনে এবং ক্যামেরার যোগে জানা গেছে যে, যে-ভিড় নিয়ে এই শেষোক্ত নীহারিকা, তাতে যত নক্ষত্র জমা হয়েছে, বহু কোটি তার সংখ্যা, অদ্ভূত দ্রুত তাদের গতি। এই যে নক্ষত্রের ভিড় নীহারিকামণ্ডলে অতি দ্রুতবেগে ছুটছে, এরা পরস্পর ধাক্কা লেগে চুরমার হয়ে যায় না কেন। উত্তর দিতে গিয়ে চৈতন্য হল এই নক্ষত্রপুঞ্জকে ভিড় বলা ভুল হয়েছে। এদের মধ্যে গলাগলি ঘেঁষাঘেঁষি একেবারেই নেই। পরস্পরের কাছ থেকে অত্যন্তই দূরে দূরে চলাফেরা করছে। পরমাণুর অন্তর্গত ইলেকট্রনদের গতিপথের দূরত্ব সম্বন্ধে স্যর জেমস্ জীন্স্ যে উপমা দিয়েছেন এই নক্ষত্রমণ্ডলীর সম্বন্ধেও অনুরূপ উপমাই তিনি প্রয়োগ করেছেন। লণ্ডনে ওয়াটর্লু নামে এক মস্ত স্টেশন আছে। যতদূর মনে পড়ে সেটা হাওড়া স্টেশনের চেয়ে বড়োই। স্যর জেম্‌স জীন্স্ বলেন সেই স্টেশন থেকে আর-সব খালি করে ফেলে কেবল ছ'টি মাত্র ধুলোর কণা যদি ছড়িয়ে দেওয়া যায় তবে আকাশে নক্ষত্রদের পরস্পর দূরত্ব এই ধূলিকণাদের বিচ্ছেদের সঙ্গে কিছু পরিমাণে তুলনীয় হতে পারবে। তিনি বলেন, নক্ষত্রের সংখ্যা ও আয়তন যতই হোক আকাশের অচিন্তনীয় শূণ্যতার সঙ্গে তার তুলনাই হতে পারে না।

বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, সৃষ্টিতে রূপবৈচিত্রের পালা আরম্ভ হবার অনেক আগে কেবল ছিল একটা পরিব্যাপ্ত জ্বলন্ত বাষ্প। গরম জিনিস মাত্রেরই ধর্ম এই যে ক্রমে ক্রমে সে তাপ ছড়াতে থাকে। ফুটন্ত জল প্রথমে বাষ্প হয়ে বেরিয়ে আসে। ঠাণ্ডা হতে হতে সেই বাষ্প জমে হয় জলের কণা। অত্যন্ত তাপ দিলে কঠিন পদার্থও ক্রমে যায় গ্যাস হয়ে; সেইরকম তাপের অবস্থায় বিশ্বের হালকা ভারী সব জিনিসই ছিল গ্যাস। কোটি কোটি বছর ধরে কালে কালে তা ঠাণ্ডা হচ্ছে। তাপ কমতে কমতে গ্যাস থেকে ছোটো ছোটো

টুকরো ঘন হয়ে ভেঙে পড়েছে। এই বিপুলসংখ্যক কণা তারার আকারে জোট বেঁধে নীহারিকা গড়ে তুলেছে। য়ুরোপীয় ভাষায় এদের বলে নেব্যুলা, বহুবচনে নেব্যুলী। আমাদের সূর্য আছে এইরকম একটি নীহারিকার অন্তর্গত হয়ে।

আমেরিকার পর্বতচূড়ায় বসানো হয়েছে মস্ত বড়ো এক দুরবীন, তার ভিতর দিয়ে খুব বড়ো এক নীহারিকা দেখা গেছে। সে আছে অ্যাণ্ড্র মিডা নামধারী নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে। ঐ নীহারিকার আকার অনেকটা গাড়ির চাকার ম□। সেই চাকা ঘুরছে। এক পাক ঘোরা শেষ করতে তার লাগে প্রায় দু কোটি বছর। নয় লাখ বছর লাগে এর কাছ থেকে পৃথিবীতে আলো এসে পৌঁছতে।

আমাদের সব চেয়ে কাছের যে তারা, যাকে আমাদের তারা-পাড়ার পড়শী বললে চলে, সংখ্যা সাজিয়ে তার দূরত্ব বোঝাবার চেষ্টা করা বৃথা। সংখ্যাবাঁধা যে-পরিমাণ দূরত্ব মোটামুটি আমাদের পক্ষে বোঝা সহজ, তার সীমা পৃথিবীর গোলকটির মধ্যেই বদ্ধ, যাকে আমরা রেলগাড়ি দিয়ে মোটর দিয়ে স্টীমার দিয়ে চলতে চলতে মেপে যাই। পৃথিবী ছাড়িয়ে নক্ষত্র-বস্তির সীমানা মাড়ালেই সংখ্যার ভাষাটাকে প্রলাপ বলে মনে হয়। গণিতশাস্ত্র নাক্ষত্রিক হিসাবটার উপর দিয়ে সংখ্যার যে-ডিম পেড়ে চলে সে যেন পৃথিবীর বহুপ্রসূ কীটেরই নকলে।

সাধারণত আমরা দূরত্ব গনি মাইল বা ক্রোশ হিসাবে, নক্ষত্রদের সম্বন্ধে তা করতে গেলে অঙ্কে বোঝা দুর্বহ হয়ে উঠবে। সূর্যই তো আমাদের কাছ থেকে যথেষ্ট দূরে, তার চেয়ে বহু লক্ষ গুণ দূরে আছে নক্ষত্রের দল, সংখ্যা দিয়ে তাদের দূরত্ব গোনা কড়ি দিয়ে হাজার হাজার মোহর গোনার মতো। সংখ্যা-সংকেত বানিয়ে মানুষ লেখনের বোঝা হালকা করেছে, হাজার লিখতে তাকে হাজারটা দাঁড়ি কাটতে হয় না। কিন্তু জ্যোতিষ্কলোকের মাপ এ সংকেতে কুলোল না। তাই আর-এক সংকেত বেরিয়েছে। তাকে বলা যায় আলো-চলার মাপ। ৩৬৬ দিনের বছর হিসাবে সে চলে পাঁচ লক্ষ আটাশি হাজার কোটি মাইল। সূর্যপ্রদক্ষিণের যেমন সৌর বছর তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের পরিমাণে, তেমনি

নক্ষত্রদের গতিবিধি, তাদের সীমা-সরহদ্দের মাপ, আলো-চলা বছরের মাত্রা গণনা ক'রে। আমাদের নক্ষত্রজগতের ব্যাস আন্দাজ একলক্ষ আলো-বছরের মাপে। আরো অনেক লক্ষ নাক্ষত্রজগৎ আছে এর বাইরে। সেই-সব ভিন্ন গাঁয়ের নক্ষত্রদের মধ্যে একটির পরিচয় ফোটাগ্রাফে ধরা হয়েছে, হিসেব মতে সে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ আলো-বছর দূরে। আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী নক্ষত্রদের দূরত্ব পঁচিশ লক্ষ কোটি মাইল। এর থেকে বোঝা যাবে কী বিপুল শূণ্যতার মধ্যে বিশ্ব ভাসছে। আজকাল শুনতে পাই পৃথিবীতে স্থানাভাব নিয়েই লড়াই বাধে। নক্ষত্রদের মাঝখানে কিছুমাত্র যদি জায়গার টানাটানি থাকত তা হলে সর্বনেশে ঠোকাঠুকিতে বিশ্ব যেত চুরমার হয়ে।

চোখে দেখার যুগ থেকে এল দুরবীনের যুগ। দুরবীনের জোর বাড়তে বাড়তে বেড়ে চলল দ্যুলোকে আমাদের দৃষ্টির পরিধি। পূর্বে যেখানে ফাঁক দেখেছি সেখানে দেখা দিল নক্ষত্রের ঝাঁক। তবু বাকি রইল অনেক। বাকি থাকবারই কথা। আমাদের নাক্ষত্রজগতের বাইরে এমন সব জগৎ আছে যাদের আলো দুরবীনদৃষ্টিরও অতীত। একটা বাতির শিখা ৮৫৭৫ মাইল দূরে যেটুকু দীপ্তি দেয় এমনতরো আভাকে দুরবীন যোগে ধরবার চেষ্টায় হার মানলে মানুষের চক্ষু। দুরবীন আপন শক্তি অনুসারে খবর এনে দেয় চোখে, চোখের যদি শক্তি না থাকে সেই অতিক্ষীণ খবরটুকু বোধের কোঠায় চালান করে দিতে, তা হলে আর উপায় থাকে না। কিন্তু ফোটোগ্রাফফলকের আলো- ধরা শক্তি চোখের শক্তির চেয়ে ঢের বেশি স্থায়ী। সেই শক্তির উদ্‌বোধন করলে বিজ্ঞান, দূরতম আকাশে জাল ফেলবার কাজে লাগিয়ে দিলে ফোটোগ্রাফ। এমন ফোটোগ্রাফি বানালে যা অন্ধকারে-মুখঢাকা আলোর উপর সমন জারি করতে পারে। দুরবীনের সঙ্গে ফোটাগ্রাফি, ফোটোগ্রাফির সঙ্গে বর্ণলিপিযন্ত্র জুড়ে দিলে। সম্প্রতি এর শক্তি আরো বিচিত্র ক'রে তুলে দেওয়া হয়েছে। সূর্যে নানা পদার্থ গ্যাস হয়ে জ্বলছে। তারা সকলে একসঙ্গে মিলে যখন দেখা দেয় তখন ওদের তন্ন তন্ন করে দেখা সম্ভব হয় না। সেই জন্যে এক আমেরিকান বিজ্ঞানী সূর্য-দেখা দুরবীন বানিয়েছেন যাতে জ্বলন্ত গ্যাসের সবরকম রঙ থেকে এক-একটি রঙের আলো ছাড়িয়ে নিয়ে তার সাহায্যে সূর্যের সেই বিশেষ গ্যাসীয় রূপ দেখা সম্ভব হয়েছে। ইচ্ছামত কেবলমাত্র জ্বলন্ত ক্যালসিয়মের রঙ কিংবা জ্বলন্ত হাইড্রজেনের রঙে সূর্যকে দেখতে

পেলে তার গ্যাসীয় অগ্নিকাণ্ডের অনেক খবর মেলে যা আর কোনো উপায়ে পাওয়া যায় না।

সাদা আলো ভাগ করতে পারলে তার বর্ণসপ্তকের এক দিকে পাওয়া যায় লাল অন্য দিকে বেগনি – এই দুই সীমাকে ছাড়িয়ে চলেছে যে আলো সে আমাদের চোখে পড়ে না।

ঘন নীলরঙের আলোর ঢেউয়ের পরিমাপ এক ইঞ্চির দেড়কোটি ভাগের এক ভাগ। অর্থাৎ এই আলোর রঙে যে ঢেউ খেলে তার একটা ঢেউয়ের চূড়া থেকে পরবর্তী ঢেউয়ের চূড়ার মাপ এই। এক ইঞ্চির মধ্যে রয়েছে দেড়কোটি ঢেউ। লাল রঙের আলোর ঢেউ প্রায় এর দ্বিগুণ লম্বা। একটা তপ্ত লোহার জ্বলন্ত লাল আলো যখন ক্রমেই নিভে আসে, আর দেখা যায় না, তখনো আরো বড়ো মাপের অদৃশ্য আলো তার থেকে ঢেউ দিয়ে উঠতে থাকে। আমাদের দৃষ্টিকে সে যদি জাগিয়ে তুলতে পারত তা হলে সেই লাল-উজানি রঙের আলোয় আমরা নিভে-আসা লোহাকে দেখতে পেতুম, তা হলে গরমিকালের সন্ধ্যাবেলার অন্ধকারে রৌদ্র মিলিয়ে গেলেও লাল-উজানি আলোয় গ্রীষ্মতপ্ত পৃথিবী আমাদের কাছে আভাসিত হয়ে দেখা দিত।

একান্ত অন্ধকার ব'লে কিছুই নেই। যাদের আমরা দেখতে পাই নে তাদেরও আলো আছে। নক্ষত্রলোকের বাহিরের নিবিড় কালো আকাশেও অনবরত নানাবিধ কিরণ বিকীর্ণ হচ্ছে। এই-সকল অদৃশ্য দূতকেও দৃশ্যপটে তুলে তাদের কাছ থেকে গোপন অস্তিত্বের খবর আদায় করতে পারছি এই বর্ণলিপিযুক্ত দুরবীন-ফোটোগ্রাফের সাহায্যে।

বেগনি-পারের আলো জ্যোতিষীদের কাছে লাল-উজানি আলোর মতো এত বেশি কাজে লাগে না। তার কারণ এই খাটো ঢেউয়ের আলোর অনেকখানি পৃথিবীর হাওয়া পেরিয়ে আসতে নষ্ট হয়, দূরলোকের খবর দেবার কাজে লাগে না। এরা খবর দেয় পরমাণুলোকের। একটা বিশেষ পরিমাণ উত্তেজনায় পরমাণু সাদা আলোয় স্পন্দিত হয়।

তেজ আরো বাড়লে দেখা দেয় বেগনি-পারের আলো। অবশেষে পরমাণুর কেন্দ্রবস্তু যখন বিচলিত হতে থাকে তখন সেই প্রবল উত্তেজনায় বের হয় আরো খাটো ঢেউ যাদের বলি গামা-রশ্মি। মানুষ তার যন্ত্রের শক্তি এতদূর বাড়িয়ে তুলেছে যে এক্স-রশ্মি বা গামা-রশ্মির মতো রশ্মিকে মানুষ ব্যবহার করতে পারে।

যে কথা বলতে যাচ্ছিলুম সে হচ্ছে এই যে, বর্ণলিপি-বাঁধা দুরবীন-ফোটোগ্রাফ দিয়ে মানুষ নক্ষত্রবিশ্বের অতি দূর অদৃশ্য লোককে দৃষ্টিপথে এনেছে। আমাদের আপন নাক্ষত্রলোকের সুদূর বাইরে আরো অনেক নাক্ষত্রলোকের ঠিকানা পাওয়া গেল। শুধু তাই নয়, নক্ষত্রেরা যে সবাই মিলে আমাদের নাক্ষত্র-আকাশে এবং দূরতর আকাশে ঘুর খাচ্ছে তাও ধরা পড়ছে এই যন্ত্রের দৃষ্টিতে।

দূর আকাশের কোনো জ্যোতির্ময় গ্যাসের পিণ্ড, যাকে বলে নক্ষত্র, যখন সে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে কিংবা পিছিয়ে যায় তখন আমাদের দৃষ্টিতে একটা বিশেষত্ব ঘটে। ঐ পদার্থটি স্থির থাকলে যে-পরিমাণ দৈর্ঘ্যের আলোর ঢেউ আমাদের অনুভূতিতে পৌঁছিয়ে দিতে পারত কাছে এলে তার চেয়ে কম দৈর্ঘ্যের ধারণা জন্মায়,দূরে গেলে তার চেয়ে বেশি। যে-সব আলোর ঢেউ দৈর্ঘ্যে কম, তাদের রঙ ফোটে বর্ণসপ্তকের বেগনির দিকে, আর যারা দৈর্ঘ্যে বেশি তারা পৌঁছয় লাল রঙের কিনারায়। এই কারণে নক্ষত্রের কাছে-আসা দূরে-যাওয়ার সংকেত ভিন্ন রঙের সিগন্যালে জানিয়ে দেয় বর্ণলিপি। শিঙে বাজিয়ে রেলগাড়ি পাশ দিয়ে চলে যাবার সময় কানে তার আওয়াজ পূর্বের চেয়ে চড়া ঠেকে। কেননা শৃঙ্গধ্বনি বাতাসে যে ঢেউ-তোলা আওয়াজ আমাদের কানে বাজায়, গাড়ি এলে সেই ঢেউগুলো পুঞ্জীভূত হয়ে কানে চড়া সুরের অনুভূতি জাগায়। আলোতে চড়া রঙের সপ্তক বেগনির দিকে।

কোনো কোনো গ্যাসীয় নীহারিকার যে উজ্জ্বলতা সে তার আপন আলোতে নয়। যে নক্ষত্রগুলি তাদের মধ্যে ভিড় করে আছে তারাই ওদের আলোকিত করেছে। আবার

কোথাও নীহারিকার পরমাণুগুলি নক্ষত্রের আলোককে নিজেরা শুষে নিয়ে ভিন্ন দৈর্ঘ্যের আলোতে তাকে চালান করে।

নীহারিকার আর-একটি বিশেষত্ব দেখতে পাওয়া যায়। তার মাঝে মাঝে মেঘের মতো কালো কালো লেপ দেওয়া আছে, নিবিড়তম তারার ভিড়ের মধ্যে এক এক জায়গায় কালো ফাঁক। জ্যোতিষী বার্ণাডের পর্যবেক্ষণে এমনতরো প্রায় দুশোটা কালো আকাশ-প্রদেশ দেখা দিয়েছে। বার্ণাড অনুমান করেন এগুলি অস্বচ্ছ গ্যাসের মেঘ, ওর পিছনের তারাগুলিকে ঢেকে রেখেছে। কোনোটা কাছে, কোনোটা দূরে, কোনোটা ছোটো, কোনোটা প্রকাণ্ড বড়ো।

নক্ষত্রলোকের অনুবর্তী আকাশে যে বস্তুপুঞ্জ ছড়িয়ে আছে তার নিবিড়তা হিসাব করলে জানা যায় যে সে অত্যন্ত কম, প্রত্যেক ঘন-ইঞ্চিতে আধ ডজন মাত্র পরমাণু। সে যে কত কম এই বিচার করলে বোঝা যাবে যে, বিজ্ঞান পরীক্ষাগারে সব চেয়ে জোরের পাম্প দিয়ে যে শূণ্যতা সৃষ্টি করা হয় তার মধ্যেও ঘন-ইঞ্চিতে বহু কোটি পরমাণু বাকি থেকে যায়।

আমাদের আপন নাক্ষত্রলোকটি প্রকাণ্ড একটা চ্যাপটা ঘুরপাক-খাওয়া জগৎ, বহু শত কোটি নক্ষত্রে পূর্ণ। তাদের মধ্যে মধ্যে যে আকাশ তাতে অতি সূক্ষ্ম গ্যাস কোথাও বা অত্যন্ত বিরল, কোথাও বা অপেক্ষাকৃত ঘন, কোথাও বা উজ্জ্বল, কোথাও বা অস্বচ্ছ। সূর্য আছে এই নাক্ষত্রলোকের কেন্দ্র থেকে তার ব্যাসের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ দূরে, একটা নাক্ষত্রমেঘের মধ্যে। নক্ষত্রগুলির বেশি ভিড় নীহারিকার কেন্দ্রের কাছে।

অ্যান্টারীজ নক্ষত্রের ব্যাস উনচল্লিশ কোটি মাইল, আর সূর্যের ব্যাস আট লক্ষ চৌষট্টি হাজার মাইল। সূর্য মাঝারি বহরের তারা বলেই গণ্য। যে নাক্ষত্রজগতের একটি মধ্যবিত্ত তারা এই সূর্য, তার মতো এমন আরো আছে লক্ষ লক্ষ জগৎ। সব নিয়ে এই যে ব্রহ্মাণ্ড কোথায় তার সীমা তা আমরা জানি নে।

আমাদের সূর্য তার সব গ্রহগুলিকে নিয়ে ঘুর খাচ্ছে আর তার সঙ্গেই ঘুরছে এই নাক্ষত্রচক্রবর্তীর সব তারাই, একটি কেন্দ্রে চার দিকে। এই মহলে সূর্যের ঘুর্ণিপাকের গতিবেগ এক সেকেণ্ডে প্রায় দুশো মাইল। চলতি চাকার থেকে ছিটকে পড়া কাদার মতোই সে ঘোরা বেগে নাক্ষত্রচক্র থেকে ছিটকে পড়ত; এই চক্রের হাজার কোটি নক্ষত্র ওকে টেনে রাখছে, সীমার বাইরে যেতে দেয় না।

এই টানের শক্তির খবরটা নিশ্চয়ই পাঠকদের জানা তবু সেটা এই বিশ্ববর্ণনা থেকে বাদ দিলে চলবে না।

সত্য হোক মিথ্যে হোক একটা গল্প চলিত আছে যে, বিজ্ঞানীশ্রেষ্ঠ ন্যুটন একদিন দেখতে পেলেন একটা আপেল ফল গাছ থেকে পড়ল, তখনই তাঁর মনে প্রশ্ন উঠল ফলটা নীচেই বা পড়ে কেন, উপরেই বা যায় না কেন উড়ে। তাঁর মনে আরো অনেক প্রশ্ন ঘুরছিল। ভাবছিলেন চাঁদ কিসের টানে পৃথিবীর চার দিকে ঘুরছে, পৃথিবীই বা কিসের টানে ঘুরছে সূর্যের চার দিকে। ফল পড়ার ব্যাপারে তিনি বুঝলেন একটা টান দেবার শক্তি আছে পৃথিবীর। সব-কিছুকে সে নিজের ভিতরের দিকে টানছে। তাই যদি হবে তবে চন্দ্রকেই বা সে ছাড়বে কেন। নিশ্চয়ই এই শক্তিটা দূরে কাছে এমন জিনিস নেই যাকে টানবে না। ভাবনাটা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। বুঝতে পারা গেল একা পৃথিবী নয় সব-কিছুই টানে সব-কিছুকে। যার মধ্যে যতটা আছে বস্তু, তার টানবার জোর ততটা। তা ছাড়া দূরত্বের কম-বেশিতে এই টানের জোরও বাড়ে-কমে। দূরত্ব দ্বিগুণ বাড়ে যদি, টান কমে যায় চার গুণ, চার গুণ বাড়লে টান কমবে ষোলো গুণ। এ না হলে সূর্যের টানে পৃথিবীর যা-কিছু সম্বল সব লুঠ হয়ে যেত। এই টানাটানির পালোয়ানিতে কাছের জিনিসের ‘পরে পৃথিবীর জিত রয়ে গেল। ন্যুটনের মৃত্যুর বছর-সত্তর পরে আর একজন ইংরেজ বিজ্ঞানী লর্ড ক্যাভেণ্ডিশ তাঁর পরখ করবার ঘরে দুটো সীসের গোলা ঝুলিয়ে প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দিয়েছেন তারা ঠিক নিয়ম মেনেই পরস্পরকে টানছে। এই নিয়মের হিসাবটি বাঁচিয়ে আমিও এই লেখার টেবিলে বসে সব-কিছুকে টানছি। পৃথিবীকে, চন্দ্রকে, সূর্যকে, বিশ্বে

যত তারা আছে তার প্রত্যেকটাকেই। যে পিঁপড়েটা এসেছে আমার ঘরের কোণে আহারের খোঁজে তাকেও টানছি; সেও দূর থেকে দিচ্ছে আমায় টান, বলা বাহুল্য আমাকে বিশেষ ব্যস্ত করতে পারে নি। আমার টানে ওরও তেমন ভাবনার কারণ ঘটল না। পৃথিবী এই আঁকড়ে ধরার জোরে অসুবিধা ঘটিয়েছে অনেক। চলতে গেলে পা তোলার দরকার। কিন্তু পৃথিবী টানে তাকে নীচের দিকে; দূরে যেতে হাঁপিয়ে পড়ি সময়ও লাগে বিস্তর। এই টেনে রাখার ব্যবস্থা গাছপালার পক্ষে খুবই ভালো। কিন্তু মানুষের পক্ষে একেবারেই নয়। তাই জন্মকাল থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই টানের সঙ্গে মানুষকে লড়াই করে চলতে হয়েছে। অনেক আগেই সে আকাশে উড়তে পারত কিন্তু পৃথিবী কিছুতেই তাকে মাটি ছাড়তে দিতে চায় না। এই চব্বিশঘন্টা টানের থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নেবার জন্যে মানুষ কল বানিয়েছে বিস্তর – এতে পৃথিবীটাকে কিছু ফাঁকি দেওয়া চলে – সম্পূর্ণ না। কিন্তু এই টানকে নমস্কার করি যখন জানি,পৃথিবী হঠাৎ যদি তার টান আলগা করে তা হলে যে ভীষণ বেগে পৃথিবী পাক খাচ্ছে তাতে আমরা তার পিঠের উপর থেকে কোথায় ছিটকে পড়ি তার ঠিকানা থাকে না। বস্তুত পৃথিবীর টানটা এমন ঠিক মাপে হয়েছে যাতে আমরা চলতে পারি অথচ পৃথিবী ছাড়তে পারি নে।

বিপরীতধর্মী বৈদ্যুতকণার যুগলমিলনে যে সৃষ্টি হল সেই জগৎটার মধ্যে সর্বব্যাপী দুই বিরুদ্ধ শক্তির ক্রিয়া, চলা আর টানা, মুক্তি আর বন্ধন। এক দিকে ব্রহ্মাণ্ডজোড়া মহা দৌড় আর-এক দিকে ব্রহ্মাণ্ডজোড়া মহা টান। সবই চলছে আর সবই টানছে। চলাটা কী আর কোথা থেকে তাও জানি নে। আর টানটা কী আর কোথা থেকে তাও জানি নে। আজকের বিজ্ঞানে বস্তুর বস্তুত্ব এসেছে অত্যন্ত সূক্ষ্ম হয়ে, সব চেয়ে প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে চলা আর টানা। চলা যদি একা থাকত তা হলে চলন হত একেবারে সিধে রাস্তায় অন্তহীনে। টানা তাকে ফিরিয়ে ফিরিয়ে আনছে অন্তবানে, ঘোরাচ্ছে চক্রপথে। সূর্য এবং গ্রহের মধ্যে আছে বহুলক্ষ মাইল ফাঁকা, সেই দূরত্বের শূণ্য পার হয়ে নিরন্তর চলেছে অশরীরী টানের শক্তি, অদৃশ্য লাগামে বেঁধে গ্রহগুলোকে ঘোরাচ্ছে সার্কাসের ঘোড়ার মতো। এ দিকে সূর্যও ঘুরছে বহুকোটি ঘূর্ণ্যমান নক্ষত্রে-তৈরি এক মহা জ্যোতিশ্চক্রের টানে। বিশ্বের অণীয়সী গতিশক্তির দিকে তাকাও, সেখানেও বিরাট চলা-টানার একই

ছন্দের লীলা। সূর্য আর গ্রহের মাঝখানের যে দূরত্ব, তুলনা করলে দেখা যাবে অতিপরমাণু জগতে প্রোটন ইলেকট্রনের মধ্যেকার দূরত্ব কম-বেশি সেই পরিমাণে। টানের জোর সেই শূণ্যকে পেরিয়ে নিত্যকাল বাঁধা পথে ঘোরাচ্ছে ইলেকট্রনের দলকে। গতি আর সংযমের অসীম সামঞ্জস্য নিয়ে সব-কিছু। এইখানে বলে রাখা দরকার, ইলেকট্রন প্রোটনের টানাটানি মহাকর্ষের নয়, সেটা বৈদ্যুত টানের। পরমাণুদের অন্তরের টানটা বৈদ্যুতের টান, বাহিরের টানটা মহাকর্ষের, যেমন মানুষের ঘরের টানটা আত্মীয়তার, বাইরের টানটা সমাজের।

মহাকর্ষ সম্বন্ধে এই যে মতের আলোচনা করা গেল ন্যুটনের সময় থেকে এটা চলে আসছে। এর থেকে আমাদের মনে এই একটা ধারণা জন্মে গেছে যে, দুই বস্তুর মাঝখানের অবকাশের ভিতর দিয়ে একটা অদৃশ্য শক্তি টানাটানি করছে।

কিন্তু এই ছবিটা মনে আনবার কিছু বাধা আছে। মহাকর্ষের ক্রিয়া একটুও সময় নেয় না। আকাশ পেরিয়ে আলো আসতে সময় লাগে সে কথা পূর্বে বলেছি। বৈদ্যুতিক শক্তিরাও ঢেউ খেলিয়ে আসে আকাশের ভিতর দিয়ে। কিন্তু অনেক পরীক্ষা করেও মহাকর্ষের বেলায় সেরকম সময় নিয়ে চলার প্রমাণ পাওয়া যায় না। তার প্রভাব তাৎক্ষণিক। আরো একটা আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আলো বা উত্তাপ পথের বাধা মানে কিন্তু মহাকর্ষ তা মানে না। একটা জিনিসকে আকাশে ঝুলিয়ে রেখে পৃথিবী আর তার মাঝখানে যত বাধাই রাখা যাক না তার ওজন কমে না। ব্যবহারে অন্য কোনো শক্তির সঙ্গে এর মিল পাওয়া যায় না।

অবশেষে আইনস্টাইন দেখিয়ে দিলেন এটা একটা শক্তিই নয়। আমরা এমন একটা জগতে আছি যার আয়তনের স্বভাব অনুসারেই প্রত্যেক বস্তুই প্রত্যেকের দিকে ঝুঁকতে বাধ্য। বস্তুমাত্র যে-আকাশে থাকে তার একটা বাঁকানো গুণ আছে, মহাকর্ষে তারই প্রকাশ। এটা সর্বব্যাপী, এটা অপরিবর্তনীয়। এমন-কি, আলোককেও এই বাঁকা বিশ্বের ধারা মানতে বাধ্য। তার নানা প্রমাণ পাওয়া গেছে। বোঝার পক্ষে টানের ছবি সহজ ছিল কিন্তু

যে-নূতন জ্যামিতির সাহায্যে এই বাঁকা আকাশের ঝোঁক হিসেব ক'রে জানা যায় সে কজন লোকেরই বা আয়ত্তে আছে।

যাই হোক ইংরেজিতে যাকে গ্রৎোভিটেশন বলে তাকে মহাকর্ষ না ব'লে ভারাবর্তন নাম দিলে গোল চুকে যায়।

আমাদের এই যে নাক্ষত্রজগৎ, এ যেন বিরাট শূণ্য আকাশের দ্বীপের মতো। এখান থেকে দেখা যায় দূরে দূরে আরো অনেক নাক্ষত্রদ্বীপ। এই দ্বীপগুলির মধ্যে সব চেয়ে আমাদের নিকটের যেটি, তাকে দেখা যায় অ্যাণ্ড্রমিডা নক্ষত্র দলের কাছে। দেখতে একটা ঝাপসা তারার মতো। সেখান থেকে যে আলো চোখে পড়ছে সে যাত্রা করে বেরিয়েছে ন লক্ষ বছর পূর্বে। কুণ্ডলীচক্র-পাকানো নীহারিকা আরো আছে আরো দূরে। তাদের মধ্যে সব চেয়ে দূরবর্তীর সম্বন্ধে হিসাবে স্থির হয়েছে যে, সে আছে তিন হাজার লক্ষ আলো-বছর দূরত্বের পথে। বহুকোটি নক্ষত্র-জড়ো-করা এই-সব নাক্ষত্রজগতের সংখ্যা একশো কোটির কম হবে না।

একটা আশ্চর্যের কথা উঠেছে এই যে কাছের দুটো তিনটে ছাড়া বাকি নাক্ষত্রজগৎগুলো আমাদের জগতের কাছ থেকে কেবলই সরে চলেছে। যেগুলি যত বেশি দূরে তাদের দৌড়-বেগও তত বেশি। এই-সব নাক্ষত্রজগতের সমষ্টি নিয়ে যে বিশ্বকে আমরা জানি কোনো কোনো পণ্ডিত ঠিক করেছেন সে ক্রমশই ফুলে উঠছে। সুতরাং যতই ফুলছে ততই নক্ষত্রপুঞ্জের পরস্পরের দূরত্ব যাচ্ছে বেড়ে। যে-বেগে তারা সরছে তাতে আর একশো ত্রিশ কোটি বছর পরে তাদের পরস্পরের দূরত্ব এখনকার চেয়ে দ্বিগুণ হবে।

অর্থাৎ এই পৃথিবীর ভূগঠনের সময়ের মধ্যে নক্ষত্রবিশ্ব আগেকার চেয়ে দ্বিগুণ ফেঁপে গিয়েছে।

শুধু এই নয়, একদল বিজ্ঞানীর মতে এই বস্তুপুঞ্জসংঘটিত বিশ্বের সঙ্গে সঙ্গে গোলকরূপী আকাশটাও বিস্ফারিত হয়ে চলেছে। এঁদের মতে আকাশের কোনো-এক বিন্দু থেকে সিধে লাইন টানলে সে লাইন অসীমে চলে না গিয়ে ঘুরে এসে এক সময়ে সেই প্রথম বিন্দুতে এসে পৌঁছয়। এই মত-অনুসারে দাঁড়াচ্ছে এই যে, আকাশ-গোলকে নক্ষত্রজগৎগুলি আছে, যেমন আছে পৃথিবী-গোলককে ঘিরে জীবজন্তু গাছপালা। সুতরাং বিশ্বজগৎটার ফেঁপে-ওঠা সেই আকাশমণ্ডলেরই বিস্ফারণের মাপে। কিন্তু মতের স্থিরতা হয় নি এ কথা মনে রাখা উচিত; আকাশ অসীম, কালও নিরবধি, এই মতটাও মরে নি। আকাশটাও বুদ্‌বুদ্‌ কি না এই প্রসঙ্গে আমাদের শাস্ত্রের মত এই যে সৃষ্টি চলেছে প্রলয়ের দিকে। সেই প্রলয়ের থেকে আবার নূতন সৃষ্টি উদ্‌ভাসিত হচ্ছে, ঘুম আর জাগার পালার মতো। অনাদিকাল থেকে সৃষ্টি ও প্রলয়ের পর্যায় দিন ও রাত্রির মতো বারে বারে ফিরে আসছে, তার আদিও নেই অন্তও নেই, এই কল্পনাই মনে আনা সহজ।

পর্সিয়ুস রাশিতে অ্যালগল নামে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র আছে। তার উজ্জ্বলতা স্থির থাকে ষাট ঘন্টা। তার পরে পাঁচ ঘন্টার শেষে তার প্রভা কমে যায় এক-তৃতীয়াংশ। আবার উজ্জ্বল হতে শুরু করে। পাঁচ ঘণ্টা পরে পূর্ণ উজ্জ্বলতা পায়, সেই ভরা ঐশ্বর্য থাকে ষাট ঘন্টা। এইরকম উজ্জ্বলতার কারণ ঘটায় ওর জুড়ি নক্ষত্র। প্রদক্ষিণের সময় ক্ষণে ক্ষণে গ্রহণ লাগে গ্রহণ ছাড়ে।

আর-একদল তারা তাদের দীপ্তি বাইরের কোনো কারণ থেকে নয়, কিন্তু ভিতরেরই কোনো জোয়ার ভাঁটায় একবার কমে একবার বাড়ে। কিছুদিন ধরে সমস্ত তারাটা হয়ে যায় বিস্ফারিত, আবার ক্রমে যায় সংকুচিত হয়ে। তার আলোটা যেন নাড়ির দব্‌দবানি। সিফিউস নক্ষত্রমণ্ডলীতে এই-সব তারা প্রথম খুঁজে পাওয়া গেছে ব’লে এদের নাম হয়েছে সিফাইড্‌স্‌। এদের খোঁজ পাওয়ার পর থেকে নাক্ষত্রজগতের দূরত্ব বের করার একটা মস্ত সুবিধা হয়েছে।

আরো একদল নক্ষত্রের কথা বলবার আছে, তারা নাম পেয়েছে নতুন নক্ষত্র। তাদের আলো হঠাৎ অতিদ্রুত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, অনেক হাজার গুণ থেকে অনেক লক্ষ গুণ পর্যন্ত। তার পরে ধীরে ধীরে অত্যন্ত ম্লান হয়ে যায়। এক কালে এই হঠাৎ-জ্বলে-ওঠা তারাদের আবির্ভাবকে নতুন আবির্ভাব মনে করে এদের নাম দেওয়া হয়েছিল নতুন তারা।

কিছুকাল পূর্বে লাসের্টা অর্থাৎ গোধিকা নামধারী নক্ষত্ররাশির কাছে একটি, যাকে বলে নতুন তারা, হঠাৎ অত্যুজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠল। পরে পরে চারটে জ্যোতির খোলস দিলে ছেড়ে। দেখা গেল ছাড়া খোলস দৌড় দিয়েছে এক সেকেণ্ডে ২২০০ মাইল বেগে। এই নক্ষত্র আছে প্রায় ২৬০০ আলো-চলা-বছর দূরে। অর্থাৎ যে তারার গ্যাস জ্বলনের উৎপতন আজ আমাদের চোখে পড়ল এটা ঘটেছিল খ্রীষ্টজন্মের সাড়ে ছশো বছর পূর্বে। তার এই-সব ছেড়ে-ফেলা গ্যাসের খোলসগুলির কী হল এ নিয়ে আন্দাজ চলেছে। সে কি ওর বন্ধন কাটিয়ে মহাশূণ্যে বিবাগী হয়ে যাচ্ছে, না ওর টানে বাঁধা পড়ে ঠাণ্ডা হয়ে ওর আনুগত্য ক'রে চলেছে। এই যে তারা জ্বলে-ওঠা, এ ঘটনাকে বিচার করে কোনো পণ্ডিত বলেছেন হয়তো এমনি করেই নক্ষত্রের বিস্ফোরণ থেকে ছাড়া-পাওয়া গ্যাসপুঞ্জ হতেই গ্রহের উৎপত্তি; হয়তো সূর্য এক সময়ে এইরকম নতুন তারার রীতি অনুসারে আপন উৎসারিত বিচ্ছিন্ন অংশ থেকেই গ্রহসন্তানদের জন্ম দিয়েছে। এ মত যদি সত্য হয় তা হল সম্ভবত প্রত্যেক প্রাচীন নক্ষত্রেরই এক সময়ে একটা বিস্ফোরণের দশা আসে, আর গ্রহবংশের সৃষ্টি করে। হয়তো আকাশে নিঃসন্তান নক্ষত্র অল্পই আছে।

দ্বিতীয় মত এই যে, বাহিরের একটা চলতি তারা অন্য আর-একটা তারার টানের এলাকার মধ্যে এসে প'ড়ে ঘটিয়েছে এই প্রলয় কাণ্ড। এই মত-অনুসারে পৃথিবীর উৎপত্তির আলোচনা পরে করা যাবে।

আমাদের নাক্ষত্রজগতে যে-সব নক্ষত্র আছে তারা নানারকমের। কেউ বা সূর্যের চেয়ে দশ হাজার গুণ বেশি আলো দেয়, কেউ বা দেয় একশো ভাগ কম। কারো বা পদার্থপুঞ্জ অত্যন্ত ঘন, কারো বা নিতান্তই পাতলা। কারো উপরিতলের তাপমাত্রা বিশ-

ত্রিশ হাজার সেন্টিগ্রেড পরিমাণে, কারো বা তিন হাজার সেন্টিগ্রেডের বেশি নয়, কেউ বা বারে বারে প্রসারিত কুঞ্চিত হতে হতে আলো-উত্তাপের জোয়ার-ভাঁটা খেলাচ্ছে, কেউ বা চলেছে একা একা; কারাও বা চলেছে জোড় বেঁধে, তাদের সংখ্যা নক্ষত্রদলের এক-তৃতীয়াংশ। জুড়ি নক্ষত্রেরা ভারাবর্তনের জালে ধরা প'ড়ে যাপন করছে প্রদক্ষিণের পালা। জুড়ির মধ্যে যার জোর কম প্রদক্ষিণের দায়টা পড়ে তারই 'পরে। যেমন সূর্য আর পৃথিবী। অবলা পৃথিবী যে কিছু টান দিচ্ছে না তা নয় কিন্তু সূর্যকে বড়ো বেশি বিচলিত করতে পারে না। প্রদক্ষিণের অনুষ্ঠানটা একা সম্পন্ন করছে পৃথিবীই। যেখানে দুই জ্যোতিষ্ক প্রায় সমান জোরের সেখানে উভয়ের মাঝামঝি জায়গায় একটা লক্ষ্য স্থির থাকে, দুই নক্ষত্র সেটাকেই প্রদক্ষিণ করে।

এই জুড়ি নক্ষত্র হল কী ক'রে তা নিয়ে আলাদা আলাদা মত শুনি। কেউ কেউ বলেন এর মূলে আছে দস্যুবৃত্তি। অর্থাৎ জোর যার মুলুক তার নীতি অনুসারে একটা তারা আর-একটাকে বন্দী ক'রে আপন সঙ্গী ক'রে রেখেছে। অন্য মতে জুড়ির জন্ম মূল নক্ষত্রের নিজেরই অঙ্গ থেকে। বুঝিয়ে বলি। নক্ষত্র যতই ঠাণ্ডা হয় ততই আঁট হয়ে ওঠে। এমনি ক'রে যতই হয় ঘন ততই তার ঘুরপাক হয় দ্রুত। সেই দ্রুতগতির ঠেলায় প্রবল হতে থাকে বাহির-মুখো বেগ। গাড়ির চাকা যখন ঘোরে খুব জোরে তখন তার মধ্যে এই বাহির-মুখো বেগ জোর পায় বলেই তার গায়ের কাদা ছিটকে পড়ে, আর তার জোড়গুলো যদি কাঁচা থাকে তা হলে তার অংশগুলো ভেঙে ছুটে যায়। নক্ষত্রের ঘুরপাকের জোর বাড়তে বাড়তে এই বাহির-মুখো বেগ বেড়ে যাওয়াতে অবশেষে একদিন সে ভেঙে দুখানা হয়ে যায়। তখন থেকে এই দুই অংশ দুই নক্ষত্র হয়ে যুগলযাত্রায় চলা শুরু করে।

কোনো কোনো জুড়ির প্রদক্ষিণের এক পাক শেষ করতে লাগে অনেক হাজার বছর। কখনো দেখা যায় ঘুরতে ঘুরতে একটি আর-একটিকে আমাদের দৃষ্টিলক্ষ্য থেকে আড়াল করে দেয়, উজ্জ্বলতায় দেয় বাধা। কিন্তু উজ্জ্বলতায় বিশেষ লোকসান ঘটত না যদি আড়ালকারী নক্ষত্র অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল না হত। নক্ষত্রে নক্ষত্রে উজ্জ্বলতার ভেদ যথেষ্ট আছে। এমনও আছে যে কোনো নক্ষত্র তার সব দীপ্তি হারিয়েছে। প্রকাণ্ড আয়তন ও প্রচণ্ড

উত্তাপ নিয়ে যে-সব নক্ষত্র তাদের বাল্যদশা শুরু করেছে, তিনকাল যাবার সময় তারা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়ে খরচ করবার মতো আলোর পুঁজি ফুঁকে দিয়েছে। শেষ দশায় এই-সব দেউলে নক্ষত্র থাকে অখ্যাত হয়ে অন্ধকারে।

বেটলজিয়ুজ নামে এক মহাকায় নক্ষত্র আছে, তার লাল আলো দেখলে বোঝা যায় তার বয়স হয়েছে যথেষ্ট। কিন্তু তবু জ্বলজ্বল করছে। অথচ আছে অনেক দূরে, পৃথিবীতে তার আলো পৌঁছতে লাগে ১৯০ বছর। আসল কথা, আয়তন এর অত্যন্ত প্রকাণ্ড, নিজের দেহের মধ্যে বহুকোটি সূর্যকে জায়গা দিতে পারে। ওদিকে বৃশ্চিক রাশিতে অ্যান্টারীজ নামক নক্ষত্র আছে, তার আয়তন বেটলজিয়ুজের প্রায় দুনো। আবার এমন নক্ষত্র আছে যারা গ্যাসময় বটে কিন্তু যাদের বস্তুপদার্থ ওজনে লোহার চেয়ে অনেক ভারী।

মহাকায় নক্ষত্রদের কায়া যে বড়ো তার কারণ এ নয় যে, তাদের বস্তুপরিমাণ বেশি, তারা অত্যন্ত বেশি ফেঁপে আছে মাত্র। আবার এমন অনেক ছোটো নক্ষত্র আছে তারা যে ছোটো তার কারণ তাদের গ্যাসে সম্বল অত্যন্ত ঠাসা ক'রে পোঁটলা-বাঁধা। সূর্যের ঘনত্ব এদের মাঝামঝি, অর্থাৎ জলের চেয়ে কিছু বেশি; ক্যাপেলা নক্ষত্রের গড়পড়তা ঘনত্ব আমাদের হাওয়ার সমান। কিন্তু সেখানে বায়ুপরিবর্তন করবার কথা যদি চিন্তা করি তা হলে মনে রাখতে হবে পরিবর্তন হবে দারুণ বেশি। আবার একেও ছাড়িয়ে গেছে কালপুরুষমণ্ডলীভুক্ত লালরঙের দানব তারা বেটলজিয়ুজ এবং বৃশ্চিক রাশির অ্যান্টারীজ। এদের ঘনত্বের এত অত্যন্ত কমতি, পৃথিবীর কোনো পদার্থের সঙ্গে তার সুদূর তুলনাও হতে পারে না। বিজ্ঞান-পরীক্ষাগারের খুব কষে পাম্প-করা পাত্রে যেটুকু গ্যাস বাকি থাকে তার চেয়েও কম।

আবার অপর কিনারায় আছে সাদা রঙের বেঁটে তারাগুলো। তাদের ঘনত্বের কাছে লোহা প্লাটিনম কিছুই ঘেঁষতে পারে না। অথচ এরা জমাট কঠিন নয়, এরা গ্যাসদেহী সূর্যেরই সগোত্র। তাদের অন্দরমহলে জ্বলুনির যে প্রচণ্ড তাপ তাতে ইলেকট্রনগুলো প্রোটনের বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তারা খালাস পায় তাঁবেদারির দায়িত্ব থেকে –

উভয়ে উভয়ের মান বাঁচিয়ে চললে যে-জায়গা জুড়ত সেটা যায় কমে, ক্রমাগতই উচ্ছৃঙ্খল ভাঙা পরমাণুর মধ্যে মাথা-ঠোকাঠুকি চলতে থাকে। পরমাণুর সেই আয়তনখর্বতা অনুসারে নক্ষত্রের আয়তন হয়ে যায় ছোটো। এ দিকে এই ভাঙাচোরার বে-আইনি শাস্তিভঙ্গ থেকে উষ্মা বেড়ে ওঠে সহজ মাত্রা ছাড়িয়ে, ঘন গ্যাস ভারী হয়ে ওঠে প্লাটিনমের তিন হাজার গুণ বেশি। সেইজন্যে বেঁটে তারাগুলো মাপে হয় ছোটো, তাপে কম হয় না, ওজনের বাড়াবাড়িতেও বড়োদের ছাড়িয়ে যায়। সিরিয়স নক্ষত্রের একটি অস্পষ্ট সঙ্গী-তারা আছে। সাধারণ গ্রহের মতো ছোটো তার মাপ, অথচ সূর্যের মতো তার বস্তুপুঞ্জের পরিমাণ। সূর্যের ঘনত্ব জলের দেড়গুণের কিছু কম, সিরিয়সের সঙ্গীটির ঘনত্ব গড়ে জলের চেয়ে পঞ্চাশ হাজার গুণ বেশি। একটা দেশলাই-বাক্সের মধ্যে এর গ্যাস ভরলে সেটা ওজনে পঞ্চাশ মণ ছাড়িয়ে যাবে। আবার পর্সিয়ুস নক্ষত্রে খুদে সঙ্গীটির ঐ পরিমাণ পদার্থ ওজনে হাজার-দশেক মণ যাবে পেরিয়ে। আবার শুনতে পাওয়া যাচ্ছে কোনো কোনো বিজ্ঞানী এ মত মানেন না। পৃথিবীর যখন নতুন গড়নপিটন হচ্ছিল তখন জলে স্থলে ঘন ঘন পরস্পরের প্রতিবাদ চলছিল, আজ যেখানে গহ্বর কাল সেখানে পাহাড়, কিছুকাল থেকে প্রাকৃতবিজ্ঞানে এই দশা ঘটিয়েছে। কত মত উঠছে নামছে তার ঠিকানা নেই।

আমাদের নাক্ষত্রজগতের নক্ষত্রের দল কেউ পুবের দিকে কেউ পশ্চিমের দিকে নানারকম পথ ধরে চলেছে। সূর্য দৌড়েছে সেকেণ্ডে প্রায় দুশো মাইল বেগে, একটা দানব তারা আছে তার দৌড়ের বেগ সেকেণ্ডে সাতশো মাইল।

কিন্তু আশ্চর্যের কথা, এদের মধ্যে কেউ এই নাক্ষত্রজগতের শাসন ছাড়িয়ে বাইরে উধাও হয়ে যায় না। এক বাঁকা-টানের মহাজালে বহুকোটি নক্ষত্র বেঁধে নিয়ে এই জগৎটা লাটিমের মতো পাক খাচ্ছে। আমাদের নাক্ষত্রজগতের দূরবর্তী বাইরেকার জগতেও এই ঘূর্ণিপাক। এ দিকে পরমাণুজগতের অণুতম আকাশেও চলেছে প্রোটন-ইলেকট্রনের ঘুরখাওয়া। কালস্রোত বেয়ে চলেছে নানা জ্যোতির্লোকের নানা আবর্ত। এইজন্যেই

আমাদের ভাষায় এই বিশ্বকে বলে জগৎ। অর্থাৎ এর সংজ্ঞা হচ্ছে এ চলছে- চলাতেই এর উৎপত্তি, চলাই এর স্বভাব।

নাক্ষত্রজগতের দেশকালের পরিমাপ পরিমাণ গতিবেগ দূরত্ব ও তার অগ্নি আবর্তের চিন্তনাতীত প্রচণ্ডতা দেখে যতই বিস্ময় বোধ করি এ কথা মানতে হবে বিশ্বে সকলের চেয়ে বড়ো আশ্চর্যর বিষয় এই যে, মানুষ তাদের জানছে, এবং নিজের আশু জীবিকার প্রয়োজন অতিক্রম করে তাদের জানতে চাচ্ছে। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ক্ষণভঙ্গুর তার দেহ, বিশ্ব ইতিহাসের কণামাত্র সময়টুকুতে সে বর্তমান, বিরাট বিশ্বসংস্থিতির অণুমাত্র স্থানে তার অবস্থান, অথচ অসীমের কাছঘেঁষা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দুস্পরিমেয় বৃহৎ ও দুরধিগম্য সূক্ষ্মের হিসাব সে রাখছে – এর চেয়ে আশ্চর্য মহিমা বিশ্বে আর কিছুই নেই, কিংবা বিপুল সৃষ্টিতে নিরবধি কালে কী জানি আর-কোনো লোকে আর-কোনো চিত্তকে অধিকার ক'রে আর-কোনো ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে কি না। কিন্তু এ কথা মানুষ প্রমাণ করেছে যে, ভূমা বাহিরের আয়তনে নয়, পরিমাণে নয়, আন্তরিক পরিপূর্ণতায়।

সৌরজগৎ

সূর্যের সঙ্গে গ্রহদের সম্বন্ধের বাঁধন বিচার করলে দেখা যায় গ্রহগুলির প্রদক্ষিণের রাস্তা সূর্যের বিষুবরেখার প্রায় সমক্ষেত্রে। এই গেল এক। আর এক কথা, সূর্য যেদিক দিয়ে আপন মেরুদণ্ডকে বেষ্টন করে ঘুর দেয়, গ্রহেরাও সেই দিক দিয়ে পাক খায় আর সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। এর থেকে বোঝা যায় সূর্যের সঙ্গে গ্রহদের সম্বন্ধ জন্মগত। তাদের সেই জন্মবিবরণের আলোচনা করা যাক।

নক্ষত্রেরা পরস্পর বহু কোটি মাইল দূরে দূরে ঘুরে বেড়াচ্ছে ব'লে তাদের গায়ে পড়া বা অতিশয় কাছে আসার সম্ভাবনা নেই বললেই হয়। কেউ কেউ আন্দাজ করেন যে, প্রায় দুশো কোটি বছর আগে এইরকমের একটি দুঃসম্ভব ঘটনাই হয়তো ঘটেছিল। একটি প্রকাণ্ড নক্ষত্র এসে পড়েছিল তখনকার যুগের সূর্যের কাছে। ঐ নক্ষত্রের টানে সূর্য এবং আগন্তুক নক্ষত্রের মধ্যে প্রচণ্ড বেগে উথলে উঠল অগ্নিবাষ্পের জোয়ারের ঢেউ। অবশেষে টানের চোটে কোনো কোনো ঢেউ বেড়ে উঠতে উঠতে ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল। সেই বড়ো নক্ষত্র হয়তো এদের কতকগুলোকে আত্মসাৎ করে থাকবে, বাকিগুলো সূর্যের প্রবল টানে তখন থেকে ঘুরতে লাগল সূর্যের চারি দিকে। তেজ ছড়িয়ে দিয়ে এরা ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত হল। সেই ছোটো-বড়ো জ্বলন্ত বাষ্পের টুকরোগুলি থেকেই গ্রহদের উৎপত্তি, পৃথিবী তাদেরই মধ্যে একটি। এরা ক্রমশ আপন তেজ ছড়িয়ে দিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গ্রহের আকার ধরেছে। আকাশে নক্ষত্রের দূরত্ব, সংখ্যা ও গতি হিসাব করে দেখা গেছে যে প্রায় পাঁচ-ছ' হাজার কোটি বছরে একবার মাত্র এরকম অপঘাত ঘটতেও পারে। গ্রহসৃষ্টির এই মত মেনে নিলে বলতে হবে যে গ্রহপরিচয়ওয়ালা নক্ষত্রসৃষ্টি এই বিশ্বে প্রায় অঘটনীয় ব্যাপার। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের অণ্ডগোলকসীমা ফেঁপে উঠতে উঠতে নক্ষত্রেরা ক্রমশই পরস্পরের কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছে এ মত যদি স্বীকার করতে হয় তা হলে পূর্বযুগে আকাশগোলক যখন সংকীর্ণ ছিল তখন তারায় তারায় ঠোকাঠুকির ব্যাপার সদা-সর্বদা ঘটত বলে ধরে নিতে হয়। সেই নক্ষত্র-মেলার ভিড়ের দিনে অনেক নক্ষত্রেরই ছিন্ন অংশ

থেকে গ্রহের উৎপত্তি সম্ভাবনা ছিল এ কথা যুক্তিসংগত। যে অবস্থায় আমাদের সূর্য অন্য সূর্যের ঠেলা খেয়েছিল সেই অবস্থাটা সেই সংকুচিত বিশ্বের দিনে এখনকার হিসাবমতে দূর সম্ভাবনীয় ছিল না বলেই মনে করে নিতে হবে। যাঁরা এই মত মেনে নেন নি তাঁদের অনেকে বলেন যে, প্রত্যেক নক্ষত্রের বিকাশের বিশেষ অবস্থায় ক্রমশ এমন একটা সময় আসে যখন সে পাকা শিমূলফলের মতো ফেটে গিয়ে প্রচণ্ড বেগে চারি দিকে পুঞ্জ পুঞ্জ অগ্নিবাষ্প ছড়িয়ে ফেলে দেয়। কোনো কোনো নক্ষত্র থেকে হঠাৎ এরকম জ্বলন্ত গ্যাস বেরিয়ে আসতে দেখা গিয়েছে। ছোটো একটি নক্ষত্র ছিল, কয়েক বছর আগে তাকে ভালো দুরবীন ছাড়া কখনো দেখা যায় নি। এক সময় দীপ্তিতে সে আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রদের প্রায় সমতুল্য হয়ে উঠল। আবার কয়েক মাস পরে আস্তে আস্তে তার প্রবল প্রতাপ এত ক্ষীণ হয়ে গেল যে, পূর্বের মতোই তাকে দুরবীন ছাড়া দেখাই গেল না। উজ্জ্বল অবস্থায় অল্প সময়ের মধ্যে এই নক্ষত্রটি পুঞ্জপুঞ্জ যে জ্বলন্ত বাষ্প চারি দিকে ছড়িয়ে দিয়েছে সেইগুলিই আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে জমাট বেঁধে গ্রহ-উপগ্রহের সৃষ্টি ঘটাতে পারে বলে অনুমান করা অসংগত নয়। এই মত স্বীকার করলে বলতে হবে যে কোটি কোটি নক্ষত্র এই অবস্থার ভিতর দিয়ে গিয়েছে, অতএব সৌরজগতের মতোই আপন আপন গ্রহদলে কোটি কোটি নাক্ষত্রজগৎ এই বিশ্ব পূর্ণ করে আছে। পৃথিবীর সব চেয়ে কাছে আছে যে নক্ষত্র তারও যদি গ্রহমণ্ডলী থাকে তবে তা দেখতে হলে যত বড়ো দুরবীনের দরকার তা আজও তৈরি হয় নি।

অল্প কিছুদিন হল কেম্ব্রিজের এক তরুণ পণ্ডিত লিট্‌লটন সৌরজগৎ-সৃষ্টি সম্বন্ধে একটি নূতন মত প্রচার করেছেন। পূর্বেই বলেছি আকাশে অনেক জোড়ানক্ষত্র পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করছে। এঁর মতে আমাদের সূর্যেরও একটি জুড়ি ছিল। ঘুরতে ঘুরতে আর-একটা ভবঘুরে জ্যোতিষ্ক এসে এই অনুচরের গায়ে পড়ে ধাক্কা মেরে তাকে অনেক দূরে ছিটকে ফেলে দিয়ে চলে গেল। চলে যেতে যেতে পরস্পর আকর্ষণের জোরে মস্ত বড়ো একটা জলন্ত বাষ্পের টানা সূত্র বের হয়ে এসেছিল; তারই ভিতর মিশিয়ে গিয়েছিল এদের উভয়ের উপাদানসামগ্রী। এই বাষ্পসূত্রের যে অংশ সূর্যের প্রবল টানে আটকা পড়ে গেল সেই বন্দী-করা গ্যাসের থেকেই জন্মেছে আমাদের গ্রহমণ্ডলী। এরা আয়তনে ছোটো

ব’লেই ঠাণ্ডা হয়ে আসতে দেরি করলে না; তাপ কমতে কমতে গ্যাসের টুকরোগুলো প্রথমে হল তরল, তার পর আরো ঠাণ্ডা হতেই তাদের শক্ত হয়ে ওঠবার দিন এল।

এ কথা মনে রেখো এ-সকল আন্দাজি মতকে নিশ্চিত প্রমাণের মধ্যে ধরে নেওয়া চলবে না।

বলা আবশ্যক, সূর্যের সমস্তটাই গ্যাস। পৃথিবীর যে-সব উপাদান মাটি ধাতু পাথরে শক্ত, তাদের সমস্তই সূর্যের মধ্যে প্রচণ্ড উত্তাপে আছে গ্যাসের অবস্থায়। বর্ণলিপিযন্ত্রের রেখাপাত থেকে তার প্রমাণ হয়ে গেছে।

কিরীটিকার অতি সূক্ষ্ম গ্যাস-আবরণের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। সেই স্তর পেরিয়ে যত ভিতরে যাওয়া যাবে, ততই দেখা দেবে ঘনতর গ্যাস এবং উষ্ণতর তাপ। সূর্যের উপরিতলের তাপমাত্রা প্রায় দশ হাজার ফারেনহাইট ডিগ্রির মাপে, অবশেষে নীচে নামতে নামতে এমন স্তরে পৌঁছব যেখানে ঠাসা গ্যাসের আর স্বচ্ছতা নেই। এই জায়গায় তাপমাত্রা এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ ডিগ্রির চেয়ে বেশি। অবশেষে কেন্দ্রে গিয়ে পাওয়া যাবে প্রায় সাত কোটি বিশ লক্ষ ডিগ্রির তাপ। যেখানে সূর্যের দেহবস্তু কঠিন লোহা পাথরের চেয়ে অনেক বেশি ঘন অথচ গ্যাসধর্মী।

সূর্যের দূরত্বের কথাটা অঙ্ক দিয়ে বলবার চেষ্টা না করে একটা কাল্পনিক ব্যাখ্যা দিয়ে বলা যাক। আমাদের দেহে যে-সব অনুভূতি ঘটছে আমাদের কাছে তার খবর-চালাচালির ব্যবস্থা করছে অসংখ্য স্পর্শনাড়ী। এই নাড়ীগুলি আমাদের শরীর ব্যাপ্ত ক’রে মিলেছে মস্তিষ্কে গিয়ে। টেলিগ্রাফের তারের মতো তাদের যোগে মস্তিষ্কে খবর আসে, আমরা জানতে পারি কোথায় পিঁপড়ে কামড়াল, জিবে যে খাদ্য লাগল সেটা মিষ্টি, যে দুধের বাটি হাতে তুললুম সে গরম। আমাদের শরীরটা হাওড়া থেকে বর্ধমানের মতো প্রশস্ত নয়, তাই খবর পেতে দেরি লাগে না। তবু অতি অল্প একটু সময় লাগেই; সে এতই অল্প যে তা মাপা শক্ত। কিন্তু পণ্ডিতেরা তাও মেপেছেন। তাঁরা পরীক্ষা করে স্থির

করেছেন যে মানুষের শরীরের মধ্য দিয়ে দৈহিক ঘটনা অনুভূতিতে পৌঁছয় সেকেণ্ডে প্রায় একশো ফুট বেগে। মনে করা যাক, এমন একটা দৈত্য আছে, পৃথিবী থেকে হাত বাড়ালে যার হাত সূর্যে পৌঁছতে পারে। দুঃসাহসী দৈত্যের হাত যতই শক্ত হোক, সূর্যের গা ছোঁবামাত্রই যাবে পুড়ে। কিন্তু পুড়ে যাওয়ার যে ক্ষতি ও যন্ত্রণা নাড়ীযোগে সেটা টের পেতে তার লাগবে প্রায় একশো ষাট বছর। তার আগেই সে মারা যায় তো জানবেই না।

সূর্যের ব্যাস ৮ লক্ষ ৬৪ হাজার মাইল; ১১০টি পৃথিবী পাশাপাশি এক সরল রেখায় রাখলে সূর্যের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌঁছতে পারে। সূর্যের ওজন পৃথিবীর চেয়ে ৩লক্ষ ৩০ হাজার গুণ বেশি, তাই নিজের দিকে সে টান দিতে পারে সেই পরিমাণ ওজনের জোরে। এই টানের জোরে সূর্য পৃথিবীকে আপন আয়ত্তে বেঁধে রাখে, কিন্তু দৌড়ের জোরে পৃথিবী আপন স্বাতন্ত্র্য রাখতে পেরেছে।

গোল আলুর ঠিক মাঝখান দিয়ে উপর থেকে নীচে পর্যন্ত যদি একটা শলা চালিয়ে দেওয়া যায় আর সেই শলাটার চার দিকে যদি আলুটাকে ঘোরানো যায়, তা হলে সেই ঘোরা যেমন হয় সেইরকম হয় ২৪ ঘণ্টায় পৃথিবীর একবার করে ঘুর-খাওয়া। আমরা বলি, পৃথিবী আপন মেরুদণ্ডের চার দিকে ঘুরছে। আমাদের শলাফোঁড়া আলুটার সঙ্গে পৃথিবীর তফাত এই যে, তার এরকম কোনো শলা নেই। মেরুদণ্ড কোনো দণ্ডই নয়। যে জায়গাটাতে শলা থাকত পারত কাল্পনিক সোজা লাইনের সেই জায়গাটাকেই বলি মেরুদণ্ড। যেমন লাটিম। সে ঘোরে আপন মাঝখানের এমন একটা খাড়া লাইনের চার দিকে যে-লাইনটা মনে-করে-নেওয়া।

মেরুদণ্ডের চার দিকে পৃথিবীর এক পাক ঘুরতে লাগে চব্বিশ ঘন্টা। সূর্যও আপন মেরুদণ্ডের চার দিকে ঘোরে। ঘুরতে কতক্ষণ লাগে তা যে উপায়ে জানা গেছে সে-কথা বলি। খুব ভোরে যখন আলোতে চোখ ধাঁধায় না তখন সূর্যের দিকে তাকালে হয়তো দেখা যাবে সূর্যের গায়ে কালো কালো দাগ আছে। এক-একটি কালো দাগ সময়ে সময়ে এত বড়ে হয়ে প্রকাশ পায় যে, সমস্ত গ্রহ, উপগ্রহ একত্র করলেও তার সমান হয় না। ছোটো

দাগগুলি মিলিয়ে যেতে বেশিদিন লাগে না, কিন্তু বড়ো বড়ো দাগ দু-তিন সপ্তাহ থাকে। দুরবীন দিয়ে দেখলে মনে হয় যেন এরা ক্রমাগত ডান দিকে ঘুরে যাচ্ছে, কিন্তু আসলে ঘুরছে এদের সবাইকে গায়ে নিয়ে সূর্য। এই কালো দাগের অনুসরণ ক'রে এই ঘুরে যাওয়ার সময়টার হিসাব পাওয়া গেছে; প্রমাণ হয়েছে যে, পৃথিবী ঘোরে চব্বিশ ঘন্টায়, সূর্য ঘোরে ছাব্বিশ দিনে।

সূর্যের দাগগুলো সূর্যের বাইরের আবরণে প্রকাণ্ড আবর্তগহ্বর। সেখান দিয়ে ভিতর থেকে উত্তপ্ত গ্যাস কুণ্ডলী আকারে ঘুরতে ঘুরতে উপরে বেরিয়ে আসছে। এর কেন্দ্রপ্রদেশ ঘোর কালো, তার নাম আম্‌ব্রা; তার চার দিকে কম-কালো বেষ্টনী, তার নাম পেনাম্‌ব্রা। এদের কালো দেখতে হয়েছে চার পাশের দীপ্তির তুলনায় – সেই আলো যদি বন্ধ করা যেত তা হলে অতি তীব্র দেখা যেত এদের জ্যোতি। সূর্যের যে দাগ খুব বড়ো তার কোনো-কোনোটার আম্‌ব্রার এক পার থেকে আর-এক পারের মাপ পঞ্চাশ হাজার মাইল, দেড় লক্ষ মাইল তাঁর পেনাম্‌ব্রার মাপ।

সূর্যের এই-সব দাগের কমা-বাড়ায় প্রভাব পৃথিবীর উপরে নানারকমে কাজ করে। যেমন আমাদের আবহাওয়ায়। প্রায় এগারো বছরের পালাক্রমে সূর্যের দাগ বাড়ে কমে। পরীক্ষায় দেখা গেছে বনস্পতির গুঁড়ির মধ্যে এই দাগি বৎসরের সাক্ষ্য আঁকা পড়ে। বড়ো গাছের গুঁড়ি কাটলে তার মধ্যে দেখা যায় প্রতি বছরের একটা করে চক্রচিহ্ন। এই চিহ্নগুলি কোনো কোনো জায়গায় ঘেঁষাঘেঁষি কোনো কোনো জায়গায় ফাঁক ফাঁক। প্রত্যেক চক্রচিহ্ন থেকে বোঝা যায় গাছটা বৎসরে কতখানি করে বেড়েছে। আমেরিকায় এরিজোনার মরুপ্রায় প্রদেশে ডাক্তার ডগলাস দেখেছেন যে, যে বছরে সূর্যের কালো দাগ বেশি দেখা দিয়েছে সেই বছরে গুঁড়ির দাগটা চওড়া হয়েছে বেশি। এরিজোনার পাইন গাছে পাঁচশো বছরের চিহ্ন গুনতে গুনতে ১৬৫০ থেকে ১৭২৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সূর্যের দাগের লক্ষণে একটা ফাঁক পড়ল। অবশেষে তিনি গ্রিনিজ মানযন্ত্র-বিভাগে সংবাদ নিয়ে জানলেন ঐ-কটা বছরে সূর্যের দাগ প্রায় ছিল না।

সূর্যের দেহ থেকে যে প্রচুর আলো বেরিয়ে চলেছে তার অতি সামান্য ভাগ গ্রহগুলিতে ঠেকে। অনেকখানিই চলে যায় শূন্যে, সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে; কোনো নক্ষত্রে পৌঁছয় চার বছরে, কোনো নক্ষত্রে ত্রিশ হাজার বছরে, কোনো নক্ষত্রে ন'লক্ষ বছরে। আমরা মনে ভাবি সূর্য আমাদেরই, আর তার আলোর দানে আমাদেরই বেশি দাবি। কিন্তু এত আলোর একটুখানি মাত্র আমাদের ছুঁয়ে যায়। তার পরে সূর্যের এই আলোকের দূত সূর্যে আর ফেরে না, কোথায় যায়, বিশ্বের কোন্ কাজে লাগে কে জানে।

জ্যোতিষ্কলোকদের সম্বন্ধে একটা আলোচনা বাকি রয়ে গেল। কোথা থেকে নিরন্তর তাদের তাপের জোগান চলছে তার সন্ধান করা দরকার পরমাণুদের মধ্যে।

ইলেকট্রন-প্রোটনের যোগে যদি কখনো একটি হীলিয়মের পরমাণু সৃষ্টি করা যায় তা হলে সেই সৃষ্টি কার্যে যে প্রচণ্ড তেজের উদ্ভব হবে তার আঘাতে আমাদের পৃথিবীতে এক সর্বনাশী প্রলয়কাণ্ড ঘটবে। এ তো গ'ড়ে তোলবার কথা। কিন্তু বস্তু ধ্বংস করতে তার চেয়ে অনেকগুণ তীব্র শক্তির প্রয়োজন। প্রোটনে ইলেকট্রনে যদি সংঘাত বাধে তা হলে সুতীব্র কিরণ বিকিরণ ক'রে তখনই তা'রা মিলিয়ে যাবে। এতে যে প্রচণ্ড তেজের উদ্ভব হয় তা কল্পনাতীত।

এইরকম কাণ্ডটাই ঘটছে নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে। সেখানে বস্তুধ্বংসের কাজ চলছে বলেই অনুমান করা সংগত। এই মত-অনুসারে সূর্য তিনশো ষাট লক্ষ কোটি টন ওজনের বস্তুপুঞ্জ প্রত্যহ খরচ করে ফেলছে। কিন্তু সূর্যের ভাণ্ডার এত বৃহৎ যে আরো বহু বহু কোটি বৎসর এইরকম অপব্যয়ের উদ্দামতা চলতে পারবে। কিন্তু বর্তমান বিশ্বের আয়ু সম্বন্ধে যে শেষহিসেব অবধারিত হয়েছে সেটা মেনে নিলে বস্তু-ভাঙনের চেয়ে বস্তু-গড়নের মতটাই বেশি খাটে। যদি ধরে নেওয়া যায় যে এক সময়ে সূর্য ছিল হাইড্রজেনের পুঞ্জ, তা হলে সেই হাইড্রজেন থেকে হীলিয়ম গড়ে উঠতে যে তেজ জাগবার কথা সেটা এখনকার হিসাবের সঙ্গে মেলে।

অতএব এই বিশ্বজগৎটা ধ্বংসের দিকে, না গ’ড়ে ওঠবার দিকে চলছে, না দুই একসঙ্গে ঘটছে সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের মতের মিল হয় নি। কয়েক বৎসর হল যে-বিকীরণশক্তি ধরা পড়েছে যার নাম দেওয়া হয়েছে কস্‌মিক রশ্মি; সেটার উদ্ভব না পৃথিবীতে না সূর্যে, এমন-কি, না নক্ষত্রলোকে। নক্ষত্রপরপারের কোনো আকাশ হতে বিশ্বসৃষ্টির ভাঙন কিংবা গড়ন থেকে সে বেরিয়ে পড়েছে এইরকম আন্দাজ করা হয়েছে।

যাই হোক, বিশ্বসৃষ্টি ব্যাপারের এই যে-সব বিপরীত বার্তাবহ-ইশারা আসছে বিজ্ঞানীদের পরীক্ষাগারে সেটা হয়তো কোনো-একটা জটিল গণনার ব্যাপারে এসে ঠেকবে। কিন্তু আমরা তো বিজ্ঞানী নই, বুঝতে পারি নে হঠাৎ অঙ্কের আরম্ভ হয় কোথা থেকে, একেবারে শেষই বা হয় কোন্‌খানে। সম্পূর্ণ-সংঘটিত বিশ্বকে নিয়ে হঠাৎ কালের আরম্ভ হল আর সদ্যোলুপ্ত বিশ্বের সঙ্গে কালের সম্পূর্ণ অন্ত হবে, আমাদের বুদ্ধিতে এর কিনারা পাই নে। বিজ্ঞানী বলবেন, বুদ্ধির কথা এখানে আসছে না, এ হল গণনার কথা; সে গণনা বর্তমান ঘটনাধারার উপরে প্রতিষ্ঠিত – এর আদি-অন্তে যদি অন্ধকার দেখি তা হলে উপায় নেই।

গ্রহলোক

গ্রহ কাকে বলে সে-কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। সূর্য হল নক্ষত্র; পৃথিবী হল গ্রহ, সূর্য থেকে ছিঁড়ে-পড়া টুকরো, ঠাণ্ডা হয়ে তার আলো গেছে নিবে। কোনো গ্রহেরই আপন আলো নেই। সূর্যের চার দিকে এই গ্রহদের প্রত্যেকের নির্দিষ্ট পথ ডিম্বরেখাকারে-কারো বা পথ সূর্যের কাছে, কারো বা পথ সূর্য থেকে বহু দূরে। সূর্যকে ঘুরে আসতে কোনো গ্রহের এক বছরের কম লাগে, কারো বা একশো বছরের বেশি। যে-গ্রহেরই ঘুরতে যত সময় লাগুক এই ঘোরার সম্বন্ধে একটি বাঁধা নিয়ম আছে, তার কখনোই ব্যতিক্রম হয় না। সূর্য পরিবারের দূর বা কাছের ছোটো বা বড়ো সকল গ্রহকেই পশ্চিম দিক থেকে পুব দিকে প্রদক্ষিণ করতে হয়। এর থেকে বোঝা যায় গ্রহেরা সূর্য থেকে একই অভিমুখে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়েছে, তাই চলবার ঝোঁক হয়েছে একই দিকে। চলতি গাড়ি থেকে নেমে পড়বার সময় গাড়ি যে মুখে চলেছে সেই দিকে শরীরের উপর একটা ঝোঁক আসে। গাড়ি থেকে পাঁচজন নামলে পাঁচজনেরই সেই এক দিকে হবে ঝোঁক। তেমনি ঘূর্ণ্যমান সূর্য থেকে বেরিয়ে পড়বার সময় সব গ্রহই একই দিকে ঝোঁক পেয়েছে। ওদের এই চলার প্রবৃত্তি থেকে ধরা পড়ে ওরা সবাই এক জাতের, সবাই একঝোঁকা।

সূর্যের সব চেয়ে কাছে আছে বুধগ্রহ, ইংরেজিতে যাকে বলে মার্করি। সে সূর্য থেকে সাড়ে-তিন কোটি মাইল মাত্র দূরে। পৃথিবী যতটা দূর বাঁচিয়ে চলে তার প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ। বুধের গায়ে ঝাপসা কিছু কিছু দাগ দেখা যায়, সেইটে লক্ষ্য করে বোঝা গেছে কেবল ওর এক পিঠ ফেরানো সূর্যের দিকে। সূর্যের চার দিক ঘুরে আসতে ওর লাগে ৮৮ দিন। নিজের মেরুদণ্ড ঘুরতেও ওর লাগে তাই। সূর্য-প্রদক্ষিণের পথে পৃথিবীর দৌড় প্রতি সেকেণ্ডে উনিশ মাইল। বুধগ্রহের দৌর তাকে ছাড়িয়ে গেছে, তার বেগ সেকেণ্ডে ত্রিশ মাইল। একে ওর রাস্তা ছোটো তাতে ওর ব্যস্ততা বেশি, তাই পৃথিবীর সিকি সময়েই ওর প্রদক্ষিণ সারা হয়ে যায়। বুধগ্রহের প্রদক্ষিণের যে-পথ সূর্য ঠিক তার কেন্দ্রে নেই, একটু

একপাশে আছে। সেইজন্যে ঘোরবার সময় বুধগ্রহ কখনো সূর্যের অপেক্ষাকৃত কাছে আসে কখনো যায় দূরে।

এই গ্রহ সূর্যের এত কাছে থাকাতে তাপ পাচ্ছে খুব বেশি। অতি সূক্ষ্ম পরিমাণ তাপ মাপবার একটি যন্ত্র বেরিয়েছে, ইংরেজিতে তার নাম □□□□□□-□□□□□□। তাকে দুরবীনের সঙ্গে জুড়ে গ্রহতারার তাপের খবর জানা যায়। এই যন্ত্রের হিসাব অনুসারে, বুধগ্রহের যে-অংশ সূর্যের দিকে ফিরে থাকে তার তাপ সীসে টিন গলাতে পারে। এই তাপে বাতাসের অণু এত বেশি বেগে চঞ্চল হয়ে ওঠে যে বুধগ্রহ তাদের ধরে রাখতে পারে না, তারা দেশ ছেড়ে শূন্যে দেয় দৌড়। বাতাসের অণু পলাতক স্বভাবের। পৃথিবীতে তারা সেকেণ্ডে দুইমাইলমাত্র বেগে ছুটোছুটি করে, তাই টানের জোরে পৃথিবী তাদের সামলিয়ে রাখতে পারে। কিন্তু যদি কোনো কারণে তাপ বেড়ে উঠে ওদের দৌড় হত সেকেণ্ডে সাত মাইল, তা হলেই পৃথিবী আপন হাওয়াকে আর বশ মানাতে পারত না।

যে-সব বিজ্ঞানী বিশ্বজগতের হিসাবনবিশ তাঁদের একটা প্রধান কাজ হচ্ছে গ্রহ-নক্ষত্রের ওজন ঠিক করা। এ কাজে সাধারণ দাঁড়িপাল্লার ওজন চলে না, তাই কৌশলে ওদের খবর আদায় করতে হয়। সেই কথাটা বুঝিয়ে বলি। মনে করো একটা গড়ানে গোলা হঠাৎ এসে পথিককে দিলে ধাক্কা, সে পড়ল দশ হাত দূরে। কতখানি ওজনের গোলা এসে জোর লাগালে মানুষটা এতখানি বিচলিত হয় তার নিয়মটা যদি জানা থাকে তা হলে এ দশ হাতের মাপটা নিয়ে গোলাটার ওজন অঙ্ক কষে বের করা যেতে পারে। একবার হঠাৎ এইরকম অঙ্ক কষার সুযোগ ঘটাতে বুধগ্রহের ওজন মাপা সহজ হয়ে গেল। সুবিধাটা ঘটিয়ে দিলে একটা ধূমকেতু। সে কথাটা বলবার আগে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার ধূমকেতুরা কী রকম ধরনের জ্যোতিষ্ক।

ধূমকেতু শব্দের মানে ধোঁয়ার নিশান। ওর চেহারা দেখে নামটার উৎপত্তি। গোল মুণ্ড আর তার পিছনে উড়ছে উজ্জ্বল একটা লম্বা পুচ্ছ। সাধারণত এই হল ওর আকার। এই

পুচ্ছটা অতি সূক্ষ্ম বাষ্পের। এত সূক্ষ্ম যে কখনো কখনো তাকে মাড়িয়ে গিয়েছে পৃথিবী, তবু সেটা অনুভব করতে পারি নি। ওর মুণ্ডটা উল্কাপিণ্ড দিয়ে তৈরি। এখনকার বড়ো বড়ো পণ্ডিতেরা এই মত স্থির করেছেন যে ধূমকেতুরা সূর্যের বাঁধা অনুচরেরই দলে। কয়েকটা থাকতে পারে যারা পরিবারভূক্ত নয় যারা আগন্তুক।

একবার একটি ধূমকেতুর প্রদক্ষিণপথে ঘটল অপঘাত। বুধের কক্ষপথের পাশ দিয়ে যখন সে চলছিল তখন বুধের সঙ্গে টানাটানিতে তার পথের হয়ে গেল গোলমাল। রেলগাড়ি রেলচ্যুত হলে আবার তাকে রেলে ঠেলে তোলা হয় কিন্তু টাইমটেবলের সময় পেরিয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে তাই ঘটল। ধূমকেতুটা আপন যখন ফিরল তখন তার নির্দিষ্ট সময় হয়েছে উত্তীর্ণ। ধূমকেতুকে যে-পরিমাণ নড়িয়ে দিতে বুধগ্রহের যতখানি টানের জোর লেগেছিল তাই নিয়ে চলল অঙ্ককষা। যার যতটা ওজন সেই পরিমাণ জোরে সে টান লাগায় এটা জানা কথা, এর থেকেই বেরিয়ে পড়ল বুধগ্রহের ওজন। দেখা গেল তেইশটা বুধগ্রহের বাটখারা চাপাতে পারলে তবেই তা পৃথিবীর ওজনের সমান হয়।

বুধগ্রহের পরের রাস্তাতেই আসে শুক্রগ্রহের প্রদক্ষিণের পালা। তার ২২৫ দিন লাগে সূর্য ঘুরে আসতে। অর্থাৎ আমাদের সাড়ে-সাত মাসে তার বৎসর। ওর মেরুদণ্ড-ঘোরা ঘূর্ণিপাপের বেগ কতটা তা নিয়ে এখনো তর্ক শেষ হয় নি। এই গ্রহটি বছরের এক সময়ে সূর্যাস্তের পরে পশ্চিম দিগন্তে দেখা দেয়, তখন তাকে বলি সন্ধ্যাতারা, আবার এই গ্রহই আর-এক সময়ে সূর্য ওঠবার আগে পূব দিকে ওঠে, তখন তাকে শুকতারা বলে জানি। কিন্তু মোটেই এ তারা নয়, খুব জ্বল্ জ্বল্ করে ব'লেই সাধারণের কাছে তারা খেতাব পেয়েছে। এর আয়তন পৃথিবীর চেয়ে অল্প-একটু কম। এই গ্রহের পথ পৃথিবীর চেয়ে আরো তিন কোটি মাইল সূর্যের কাছে। সেও কম নয়। যথোচিত দূর বাঁচিয়ে আছে তবু এর ভিতরকার খবর ভালো করে পাই নে। সে সূর্যের আলোর প্রখর আবরণের জন্যে নয়। বুধকে ঢেকেছে সূর্যেরই আলো, আর শুক্রকে ঢেকেছে এর নিজেরই ঘন মেঘ। বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন শুক্রগ্রহের যে উত্তাপ তাতে জলের বিশেষ রূপান্তর হয় না। কাজেই ওখানে জলাশয় আর মেঘ দুইয়ের অস্তিত্বই আশা করতে পারি।

মেঘের উপরিতলা থেকে যতটা আন্দাজ করা যায় তাতে প্রমাণ হয় এই গ্রহের অক্সিজেন-সম্বল নিতান্তই সামান্য। ওখানে যে-গ্যাসের স্পষ্ট চিহ্ন পাওয়া যায় সে হচ্ছে আঙ্গারিক গ্যাস। মেঘের উপরতলায় তার পরিমাণ পৃথিবীর ঐ গ্যাসর চেয়ে বহু হাজার গুণ বেশি। পৃথিবীর এই গ্যাসের প্রধান ব্যবহার লাগে গাছপালার খাদ্য জোগাতে।

এই আঙ্গারিক গ্যাসের ঘন আবরণে গ্রহটি যেন কম্বলচাপা। তার ভিতরের গরম বেরিয়ে আসতে পারে না। সুতরাং শুক্রগ্রহের উপরিতল ফুটন্ত জলের মতো কিংবা তার চেয়ে বেশি উষ্ণ।

শুক্রে জোলো বাষ্পের সন্ধান যে পাওয়া গেল না সেটা আশ্চর্যের কথা। শুক্রের ঘন মেঘ তা হলে কিসের থেকে সে কথা ভাবতে হয়। সম্ভব এই যে মেঘের উচ্চস্তরে ঠাণ্ডায় জল এত জমে গেছে যে তার থেকে বাষ্প পাওয়া যায় না।

এ কথাটা বিশেষ করে ভেবে দেখবার বিষয়। পৃথিবীতে সৃষ্টির প্রথম যুগে যখন গলিত বস্তুগুলো ঠাণ্ডা হয়ে জমাট বাঁধতে লাগল তখন অনেক পরিমাণে জোলো বাষ্প আর আঙ্গারিক গ্যাসের উদ্ভব হল। তাপ আরো কমলে পর জোলো বাষ্প জল হয়ে গ্রহতলে সমুদ্র বিস্তার করে দিলে। তখন বাতাসে যে-সব গ্যাসের প্রাধান্য ছিল তারা নাইট্রজেনের মতো সব নিষ্ক্রিয় গ্যাস। অক্সিজেন গ্যাসটা তৎপর জাতের মিশুক, অন্যান্য পদার্থের সঙ্গে মিশে যৌগিক পদার্থ তৈরি করা তার স্বভাব। এমনি করে নিজেকে সে রূপান্তরিত করতে থাকে। তৎসত্ত্বেও পৃথিবীর হাওয়ায় এতটা পরিমাণ অক্সিজেন বিশুদ্ধ হয়ে টিঁকল কী করে।

তার প্রধান কারণ পৃথিবীর গাছপালা। উদ্ভিদেরা বাতাসের আঙ্গারিক গ্যাস থেকে অঙ্গার পদার্থ নিয়ে নিজেদের জীবকোষ তৈরি করে, মুক্তি দেয় অক্সিজেনকে। তার পরে প্রাণীদের নিশ্বাস ও লতাপাতার পচানি থেকে আবার আঙ্গারিক গ্যাস উঠে আপন তহবিল

পূরণ করে। পৃথিবীতে সম্ভবত প্রাণের বড়ো অধ্যায়টা আরম্ভ হল তখনই যখন সামান্য কিছু অক্সিজেন ছিল সেই আদিকালের উদ্ভিদের মধ্যে। এই উদ্ভিদের পালা যতই বেড়ে চলল ততই তাদের নিশ্বাসে অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়িয়ে তুললে। কমে গলে আঙ্গারিক গ্যাস।

অতএব সম্ভবত শুক্রগ্রহের অবস্থা সেই আদিকালের পৃথিবীর মতো। একদিন হয়তো কোনো ফাঁকে উদ্ভিদ দেখা দেবে, আর আঙ্গারিক গ্যাস থেকে অক্সিজেনকে ছাড়া দিতে থাকবে। তার পরে বহু দীর্ঘকালে ক্রমশ জীবজন্তুর পালা হবে শুরু। চাঁদ আর বুধগ্রহের অবস্থা ঠিক এর উলটো। সেখানে জীবপালনযোগ্য হাওয়া টানের দুর্বলতাবশত দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গিয়েছিল।

সৌরমণ্ডলীতে শুক্রগ্রহের পরের আসনটা পৃথিবীর। অন্য গ্রহদের কথা শেষ করে তার পরে পৃথিবীর খবর নেওয়া যাবে।

পৃথিবীর পরের পঙ্‌ক্তিতেই মঙ্গলগ্রহের স্থান। এই লালচে রঙের গ্রহটিই অন্য গ্রহদের চেয়ে পৃথিবীর সব চেয়ে কাছে। এর আয়তন পৃথিবীর প্রায় নয় ভাগের এক ভাগ। সূর্যের চার দিকে একবার ঘুরে আসতে এর লাগে ৬৮৭ দিন। যে-পথে এ সূর্যের প্রদক্ষিণ করছে তা অনেকটা ডিমের মতো; তাই ঘোরার সময় একবার সে আসে সূর্যের কাছে আবার যা দূরে। আপন মেরুদণ্ডের চার দিকে এ গ্রহের ঘুরতে লাগে পৃথিবীর চেয়ে আধঘন্টা মাত্র বেশি, তাই সেখানকার দিনরাত্রি আমাদের পৃথিবীর দিনরাত্রির চেয়ে একটু বড়ো। এই গ্রহে যে পরিমাণ বস্তু আছে, তা পৃথিবীর বস্তুমাত্রার দশ ভাগের এক ভাগ, তাই টানবার শক্তিও সেই পরিমাণে কম।

সূর্যের টানে মঙ্গলগ্রহের ঠিক যে-পথ বেয়ে চলা উচিত ছিল, তার থেকে ওর চাল একটু তফাত। পৃথিবীর টানে ওর এই দশা। ওজন অনুসারে টানের জোরে পৃথিবী মঙ্গলগ্রহকে কতখানি টলিয়েছে সেইটে হিসেব করে পৃথিবীর ওজন ঠিক হয়েছে। এই

সূত্রে সূর্যের দূরত্বও ধরা পড়ল। কেননা মঙ্গলকে সূর্যও টানছে পৃথিবীও টানছে, সূর্য কতটা পরিমাণে দূরে থাকলে দুই টানে কাটাকাটি হয়ে মঙ্গলের এইটুকু বিচলিত হওয়া সম্ভব সেটা গণনা করে বের করা যেতে পারে। মঙ্গলগ্রহ বিশেষ বড়ো গ্রহ নয়,তার ওজনও অপেক্ষাকৃত কম, সুতরাং সেই অনুসারে টানের জোর বেশি না হওয়াতে তার হাওয়া খোওয়াবার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু সূর্য থেকে যথেষ্ট দূরে আছে বলে এতটা তাপ পায় না যাতে হাওয়ার অণু গরমে উধাও হয়ে চলে যেতে পারে। মঙ্গলগ্রহের হাওয়ায় অক্সিজেন সন্ধানের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। সামান্য কিছু থাকতে পারে। মঙ্গলগ্রহের লাল রঙে অনুমান হয় সেখানকার পাথরগুলো অক্সিজেনের সংযোগে সম্পূর্ণ মরচে-পড়া হয়ে গেছে। আর জলীয় বাষ্পের যা-চিহ্ন পাওয়া গেল তা পৃথিবীর জলীয় বাষ্পের শতকরা পাঁচ ভাগের এক ভাগ। মঙ্গলগ্রহের হাওয়ায় এই যে অকিঞ্চনতার লক্ষণ দেখা যায় তাতে বোঝা যায় পৃথিবী ক্রমে ক্রমে একদিন আপন সম্বল খুইয়ে এই দশায় পৌঁছবে।

পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বের চেয়ে মঙ্গল থেকে তার দূরত্ব বেশি অতএব নিঃসন্দেহ এ গ্রহ অনেকটা ঠাণ্ডা। দিনের বেলায় বিষুবপ্রদেশে হয়তো কিছু গরম থাকে কিন্তু রাতে নিঃসন্দেহ বরফজমা শীতের চেয়ে আরো অনেক শীত বেশি। বরফের টুপি-পরা তার মেরুপ্রদেশের তো কথাই নেই।

এই গ্রহের মেরুপ্রদেশে বরফের টুপিটা বাড়ে-কমে, মাঝে মাঝে তাদের দেখাও যায় না। এই গলে-যাওয়া টুপির আকার-পরিবর্তন যন্ত্রদৃষ্টিতে ধরা পড়ে। এই গ্রহতলের অনেকটা ভাগ মরুর মতো শুকনো। কেবল গ্রীষ্মঋতুতে কোনো কোনো অংশ শ্যামবর্ণ হয়ে ওঠে, সম্ভবত জল চলার রাস্তায় বরফ গলার দিনে গাছপালা গজিয়ে উঠতে থাকে।

মঙ্গলগ্রহকে নিয়ে পণ্ডিতে পণ্ডিতে একটা তর্ক চলেছে অনেকদিন ধরে। একদা একজন ইতালীয় বিজ্ঞানী মঙ্গলে লম্বা লম্বা আঁচড় দেখতে পেলেন, বললেন, নিশ্চয়ই এ গ্রহের বাসিন্দেরা মেরুপ্রদেশ থেকে বরফ-গলা জল পাবার জন্যে খাল কেটেছে। আবার কোনো কোনো বিজ্ঞানী বললেন, ওটা চোখের ভুল। ইদানীং জ্যোতিষ্কলোকের দিকে

মানুষ ক্যামেরা চালিয়েছে। সেই ক্যামেরা-তোলা ছবিতেও কালো দাগ দেখা যায়। কিন্তু ওগুলো যে কৃত্রিম খাল, আর বুদ্ধিমান জীবেরই কীর্তি, সেটা নিতান্তই আন্দাজের কথা। অবশ্য এ গ্রহে প্রাণী থাকা অসম্ভব নয়, কেননা এখানে হাওয়া জল আছে।

দুটি উপগ্রহ মঙ্গলগ্রহের চারি দিকে ঘুরে বেড়ায়। একটির এক পাক শেষ করতে লাগে ত্রিশ ঘন্টা, আর-একটির সাড়ে-সাত ঘন্টা, অর্থাৎ মঙ্গলগ্রহের এক দিনরাত্রির মধ্যে সে তাকে ঘুরে আসে প্রায় তিনবার। আমাদের চাঁদের চেয়ে এরা প্রদক্ষিণের কাজ সেরে নেয় অনেক শীঘ্র।

মঙ্গল আর বৃহস্পতিগ্রহের কক্ষপথের মাঝখানে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা দেখে পণ্ডিতেরা সন্দেহ ক'রে খোঁজ করতে লেগে গেলেন। প্রথমে অতি ছোটো চারটি গ্রহ দেখা দিল। তার পরে দেখা গেল ওখানে বহুহাজার টুকরো-গ্রহের ভিড়। ঝাঁকে ঝাঁকে তারা ঘুরছে সূর্যের চারি দিকে। ওদের নাম দেওয়া যাক গ্রহিকা। ইংরেজিতে বলে □□□□□□□□□। প্রথম যার দর্শন পাওয়া গেল তার নাম দেওয়া হয়েছে সীরিজ (□□□□□), তার ব্যাস চারশো পঁচিশ মাইল। ঈরস (□□□□) বলে একটি গ্রহিকা আছে, সূর্যপ্রদক্ষিণের সময় সে পৃথিবীর যত কাছে আসে, এমন আর কোনো গ্রহই আসে না। এরা এত ছোটো যে এদের ভিতরকার কোনো বিশেষ খবর পাওয়া যায় না। এদের সবগুলোকে জড়িয়ে যে ওজন পাওয়া যায় তা পৃথিবীর ওজনের সিকিভাগেরও কম। মঙ্গলের চেয়ে কম, নইলে মঙ্গলের চলার পথে টান লাগিয়ে কিছু গোল বাধাত।

এই টুকরো-গ্রহগুলিকে কোনো একটা আস্ত-গ্রহেরই ভগ্নশেষ বলে মনে করা যেতে পারে। কিন্তু পণ্ডিতেরা বলেন সে কথা যথার্থ নয়। বলা যায় না কী কারণে এরা জোট বেঁধে গ্রহ আকার ধরতে পারে নি।

এই গ্রহিকাদের প্রসঙ্গে আর-এক দলের কথা বলা উচিত। তারাও অতি ছোটো, তারাও ঝাঁক বেঁধে চলে এবং নির্দিষ্ট পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণও করে থাকে, তারা উল্কাপিণ্ডের দল। পৃথিবীতে ক্রমাগতই তাদের বর্ষণ চলছে, ধুলার সঙ্গে তাদের যে ছাই মিশেছে সে বড়ো কম নয়। পৃথিবীর উপরে হাওয়ার চাঁদোয়া না থাকলে এই-সব ক্ষুদ্র শত্রুর আক্রমণে আমাদের রক্ষা থাকত না।

উল্কাপাত দিনে রাতে কিছু-না-কিছু হয়ে থাকে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ মাসের বিশেষ বিশেষ দিনে উল্কাপাতের ঘটা হয় বেশি। ২১ এপ্রিল, ৯,১০,১১ আগস্ট, ১২, ১৩, ১৪ ও ২৭ নভেম্বরের রাত্রে এই উল্কাবৃষ্টির আতশবাজি দেখবার মতো জিনিস। এ সম্বন্ধে দিনক্ষণের বাঁধাবাঁধি দেখে বিজ্ঞানীরা কারণ খোঁজ করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন।

ব্যাপারটা হচ্ছে এই, ওদের একটা বিশেষ পথ আছে। কিন্তু গ্রহদের মতো ওরা একা চলে না, ওরা দ্যুলোকের দলবাঁধা পঙ্গপালের জাত। লক্ষ লক্ষ চলেছে ভিড় করে এক রাস্তায়। বৎসরের বিশেষ বিশেষ দিনে পৃথিবী গিয়ে পড়ে ঠিক ওদের যেখানে জটলা। পৃথিবী টান ওরা সামলাতে পারে না। রাশি রাশি বর্ষণ হতে থাকে। পৃথিবীর ধুলোয় ধুলো হয়ে যায়। কখনো কখনো বড়ে বড়ো টুকরোও পড়ে, ফেটেফুটে চারি দিক ছারখার করে দেয়। সূর্যের এলেকায় অনধিকার প্রবেশ ক’রে বিপন্ন হয়েছে এমন ধূমকেতুর এরা দুর্ভাগ্যের নিদর্শন। এমন কথাও শোনা যায়, তরুণ বয়সে পৃথিবীর অন্তরে যখন তাপ ছিল বেশি তখন অগ্ন্যুৎপাতে পৃথিবীর ভিতরের সামগ্রী এত উপরে ছুটে গিয়েছিল যে পৃথিবীর টান এড়িয়ে গিয়ে সূর্যের চার দিকে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে, মাঝে মাঝে নাগাল পেলেই আবার তাদের পৃথিবী নেয় টেনে। বিশেষ বিশেষ দিনে সেই উল্কার যেন হরির লুট হতে থাকে। আবার এমন অনেক উল্কাপিণ্ডের সন্ধান মিলেছে যারা সৌরমণ্ডলীর বাইরে থেকে এসে ধরা পড়ে পৃথিবীর টানে। বিশ্বের কোথাও হয়তো একটা প্রলয়কাণ্ড ঘটেছিল যার উদ্দামতায় বস্তুপিণ্ড ভেঙে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়েছিল। এই উল্কার দল আজ তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে।

এই অতিক্ষুদ্রদের পরের রাস্তাতেই দেখা দেয় অতিমস্তবড়ো গ্রহ বৃহস্পতি।

এই বৃহস্পতিগ্রহের কাছ থেকে কোনো পাকা খবর প্রত্যাশা করার পূর্বে দুটি জিনিস লক্ষ্য করা দরকার। সূর্য থেকে তার দূরত্ব, আর তার আয়তন। পৃথিবীর দূরত্ব ৯ কোটি মাইলের কিছু উপর আর বৃহস্পতির দূরত্ব ৪৮ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল, অর্থাৎ পৃথিবীর দূরত্বের চেয়ে পাঁচগুণেরও বেশি। পৃথিবী সূর্যের যতটা তাপ পায়, বৃহস্পতি পায় তার সাতাশ ভাগের এক ভাগ মাত্র।

এককালে জ্যোতিষীরা আন্দাজ করেছিলেন যে, বৃহস্পতিগ্রহ পৃথিবীর মতো এত ঠাণ্ডা হয়ে যায় নি, তার নিজের যথেষ্ট তাপের সঞ্চয় আছে। তার বায়ুমণ্ডলের সর্বদা যে চঞ্চলতা দেখা যায় তার নিজের অন্তরের তাপই তার কারণ। কিন্তু যখন বৃহস্পতির তাপমাত্রার হিসাব কষা সম্ভব হল তখন দেখা গেল গ্রহটি অত্যন্তই ঠাণ্ডা। বরফজমা শৈত্যের চেয়ে আরো ২৮০ ফারেনহাইট ডিগ্রির তলায় পৌঁছায় তার তাপমাত্রা। এত অত্যন্ত বেশি ঠাণ্ডায় বৃহস্পতির জোলো বাষ্প থাকতেই পারে না। তার বায়ুমণ্ডল থেকে দুটো গ্যাসের কিনারা পাওয়া গেল। একটা হচ্ছে অ্যামোনিয়া, নিশাদলে যার তীব্রগন্ধে চমক লাগায়, আর একটা আলেয়া গ্যাস, মাঠের মধ্যে পথিকদের পথ ভোলাবার জন্যে যার নাম আছে। নানা প্রকার যুক্তি মিলিয়ে আপাতত স্থির হয়েছে যে, বৃহস্পতির দেহ কঠিন, প্রায় পৃথিবীর সমান ঘন। বৃহস্পতির ভিতরকার পাথুরে জঠরটার প্রসার বাইশ হাজার মাইল; এর উপর বরফের স্তর জমে রয়েছে ষোলো হাজার মাইল। এই বরফপুঞ্জের উপরে আছে ৬০০০ মাইল বায়ুস্তর। এতবড়ো রাশকরা বাতাসের প্রবল চাপে হাইড্রজেনও তরল হয়ে যায়। অতএব এই গ্রহে ঘটেছে কঠিন বরফস্তরের উপরে তরল গ্যাসের সমুদ্র। আর তার বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বস্তর তরল অ্যামোনিয়া বিন্দুতে তৈরি।

বৃহস্পতি অতিকায় গ্রহ, ওর ব্যাস প্রায় নব্বই হাজার মাইল, আয়তনে পৃথিবীর চেয়ে তেরোশোগুণ বড়ো।

সূর্যপ্রদক্ষিণ করতে বৃহস্পতির লাগে প্রায় বারো বৎসর। দূরে থাকাতে ওর কক্ষপথ পৃথিবী থেকে অনেক বড়ো হয়েছে সন্দেহ নেই কিন্তু ও চলেও যথেষ্ট মন্দ গমনে। পৃথিবী যেখানে উনিশ মাইল চলে এক সেকেণ্ডে, ও চলে আট মাইল মাত্র। কিন্তু ওর স্বাবর্তন অর্থাৎ নিজের মেরুদণ্ডের চার দিকে ঘোরা খুবই দ্রুত বেগে। অতবড়ো বিপুল দেহটাকে পাক খাওয়াতে ওর লাগে দশ ঘন্টা। আমাদের এক দিন এক রাত্রি সময়ের মধ্যে ওর দুই দিনরাত্রি শেষ হয়েও উদ্‌বৃত্ত থাকে।

নয়টি উপগ্রহ নিয়ে বৃহস্পতির পরিবারমণ্ডলী। দশম উপগ্রহের খবর পাওয়া গেছে, কিন্তু সে-খবর পাকা হয় নি। পৃথিবীর চাঁদের চেয়ে এই চাঁদগুলোর বৃহস্পতি প্রদক্ষিণবেগ অনেক বেশি দ্রত। প্রথম চারটি উপগ্রহ আমাদেরই চাঁদের মতো বড়ো। তাদেরও আছে অমাবস্যা পূর্ণিমা এবং ক্ষয়বৃদ্ধি।

বৃহস্পতির সবদূরের দুটি উপগ্রহ তার দলের অন্যান্য উপগ্রহের উলটো মুখে চলে। এর থেকে কেউ কেউ আন্দাজ করেন, এরা এককালে ছিল দুটো গ্রহিকা, বৃহস্পতির টানে ধরা পড়ে গেছে।

আলো যে এক সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল বেগে ছুটে চলে তা প্রথম স্থির হয় বৃহস্পতির চন্দ্রগ্রহণ থেকে। হিসাব মতে বৃহস্পতির উপগ্রহের গ্রহণ যখন ঘটবার কথা, প্রত্যেক বারে তার কিছুকাল পরে ঘটতে দেখা যায়। তার কারণ, ওর আলো আমাদের চোখে পড়তে কিছু দেরি করে। একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ সময় নিয়ে আলো চলে, এ যদি না হত তা হলে গ্রহণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রহণের ঘটনাটা দেখা যেত। পৃথিবী থেকে এই উপগ্রহের দূরত্ব মেপে ও গ্রহণের মেয়াদ কতটা পেরিয়েছে সেটা। লক্ষ্য ক'রে আলোর বেগ প্রথম হিসাব করা হয়।

বৃহস্পতির নিজস্ব আলো নেই তার প্রমাণ পাওয়া যায় বৃহস্পতির নয়-নয়টি উপগ্রহের গ্রহণের সময়। গ্রহণটা হয় কী ক'রে ভেবে দেখো। কোনো এক যোগাযোগে

যখন সূর্য থাকে পিছনে, আর গ্রহ থাকে আলো আড়াল ক'রে সূর্যের সামনে, আর তারাও সামনে থাকে গ্রহের ছায়ায় উপগ্রহ, তখনই সূর্যালোক পেতে বাধা পেয়ে উপগ্রহে লাগে গ্রহণ। কিন্তু মধ্যবর্তী গ্রহের নিজেরই যদি আলো থাকত, তা হলে সেই আলো পড়ত উপগ্রহে, গ্রহণ হতেই পারত না। আমাদের চাঁদের গ্রহণেও সেই একই কথা। চাঁদের কাছ থেকে সূর্যকে যখন সে আড়াল করে, তখন জ্যোতির্হীন পৃথিবী চাঁদকে ছায়াই দিতে পারে, নিজের থেকে আলো দিতে পারে না।

বৃহস্পতিগ্রহের পরের পঙ্‌ক্তিতে আসে শনিগ্রহ।

এ গ্রহ আছে সূর্য থেকে ৮৮ কোটি ৬০ লক্ষ মাইল দূরে। আর ২৯১/২ বছরে এক পাক তার সূর্যপ্রদক্ষিণ। শনির বেগ বৃহস্পতির চেয়েও কম – এক সেকেণ্ডে ছ'মাইল মাত্র। বৃহস্পতি ছাড়া সৌরজগতের অন্য গ্রহের চেয়ে এর আকার অনেক বড়ো; এর ব্যাস পৃথিবীর প্রায় ৯ গুণ। পৃথিবীর ব্যাসের চেয়ে নয়গুণ বড়ো হয়েও এক পাক ঘুর খেতে ওর লাগে পৃথিবীর অর্ধেকের চেয়েও কম সময়। এত জোরে ঘুরছে ব'লে সেই বেগের ঠেলায় ওর আকার হয়েছে কিছু চ্যাপটা ধরনের। এত বড়ো এর আয়তন অথচ ওজন পৃথিবীর ৯৫ গুণ মাত্র বেশি। এত হালকা ব'লে এই প্রকাণ্ড আয়তন সত্ত্বেও টানবার শক্তি পৃথিবীর চেয়ে এর বেশি নয়। একটি মেঘের আবরণ একে ঘিরে আছে, যার আকার-বদল মাঝে মাঝে দেখা যায়।

শনির উপগ্রহ আছে নয়টি। সব চেয়ে বড়ো যেটি, আয়তনে সে বুধগ্রহের চেয়েও বড়ো; প্রায় আট লক্ষ মাইল দূরে থাকে, ষোলো দিনে তার প্রদক্ষিণ শেষ হয়।

শনিগ্রহের বেষ্টনীর বর্ণচ্ছটা-পরীক্ষায় দেখা যে এই বেষ্টনীর যে-সব অংশ গ্রহের কাছাকাছি আছে তাদের চলনবেগ বাইরের দূরবর্তী অংশের চেয়ে অনেক বেশি। বেষ্টনী যদি অখণ্ড চাকার মতো হত, তা হলে ঘূর্ণিচাকার নিয়মে বেগটা বাইরের দিকে বেশি হত। কিন্তু শনির বেষ্টনী যদি খণ্ড জিনিস নিয়ে হয় তা হলে তাদের যে দল গ্রহের কাছে, টানের

জোরে তারাই ঘুরবে বেশি বেগে। এই- সব লক্ষ লক্ষ টুকরো-উপগ্রহ ছাড়াও ন'টি বড়ো উপগ্রহ ভিন্নপথে শনিগ্রহকে প্রদক্ষিণ করছে।

কী ক' রে যে এ গ্রহের চারি দিকে দলে দলে ছোটো ছোটো টুকরো সৃষ্টি হল, সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের যে মত তারই কিছু এখানে বলা যাক। গ্রহের প্রবল টানে কোনো উপগ্রহই আপন গোল আকার রাখতে পারে না, শেষ পর্যন্ত অনেকটা তার ডিমের মতো চেহারা হয়। অবশেষে এমন এক সময় আসে যখন টান আর সহ্য করতে না পেরে উপগ্রহ ভেঙে দু-টুকরো হয়ে যায়। এই ছোটো টুকরো দুটিও আবার ভাঙতে থাকে। এমনি করে ভাঙতে ভাঙতে একটিমাত্র উপগ্রহ থেকে লক্ষ লক্ষ টুকরো বেরোনো অসম্ভব হয় না। চাঁদেরও একদিন এই দশা হবার কথা। বিজ্ঞানীরা বলেন যে, প্রত্যেক গ্রহকে ঘিরে আছে একটি করে অদৃশ্য মণ্ডলীর বেড়া, তাকে বলে বিপদের গণ্ডি। তার মধ্যে এসে পড়লেই উপগ্রহের দেশ ফেঁপে উঠে ডিমের মতো লম্বাটে আকার ধরে, তার পরে থাকে ভাঙতে। শেষকালে টুকরোগুলো জোট বেঁধে ঘুরতে থাকে গ্রহের চার দিকে। বিজ্ঞানীদের মতে বৃহস্পতির প্রথম উপগ্রহ এই অদৃশ্য বিপদগণ্ডির কাছে এসে পড়েছে, আর-কিছু দিন পরে সেখানে ঢুকলেই খণ্ড খণ্ড হয়ে যাবে। শনিগ্রহের মতো বৃহস্পতির চার দিক ঘিরে তখন তৈরি হবে একটি উজ্জ্বল বেষ্টনী। শনিগ্রহের চার দিকে যে বেষ্টনীর কথা বলা হল তার সৃষ্টি সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা আন্দাজ করেন যে, অনেকদিন আগে শনির একটি উপগ্রহ ঘুরতে ঘুরতে এর বিপদগণ্ডির ভিতরে গিয়ে পড়েছিল, তার ফলে উপগ্রহটা ভেঙে টুকরো হয়ে আজও এই গ্রহের চার দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পৃথিবীর বিপদগণ্ডির অনেকটা বাইরে আছে বলে চাঁদের যা পরিবর্তন হয়েছে তা খুব বেশি না। পৃথিবীর টানের জোরে আস্তে আস্তে চাঁদ তার কাছে এগিয়ে আসছে, তার পরে যখন ঐ বেড়ার মধ্যে অপঘাতের এলেকায় প্রবেশ করবে তখন যাবে টুকরো টুকরো হয়ে, আর সেই টুকরোগুলো পৃথিবীর চার দিক ঘিরে শনিগ্রহের নকল করতে থাকবে, তখন হবে তার শনির দশা।

কেম্ব্রিজের অধ্যাপক জেফ্‌রের মত এর উলটো। তিনি বলেন চাঁদে পৃথিবীতে দূরত্ব বেড়েই চলেছে। অবশেষে চান্দ্রমাসে সৌরমাসে সমান হয়ে যাবে, তখন কাছের দিকে টানবার পালা শুরু হবে।

বৃহস্পতির চেয়ে শনি সূর্য থেকে আরো বেশি দূরে – কাজেই ঠাণ্ডাও আরো বেশি। এর বাইরের দিকের বায়ুমণ্ডল অনেকটা বৃহস্পতির মতো, কেবল অ্যামোনিয়া তত বেশি জানা যায় না, আলেয়া গ্যাসের পরিমাণ শনিতে বৃহস্পতির চেয়ে বেশি। শনি যদিও পৃথিবীর চেয়ে আয়তনে অনেক বড়ো তবু তার ওজন সে-পরিমাণে বেশি নয়। বৃহস্পতির মতো এর বায়ুমণ্ডল গভীর হবার কথা, কেননা এর টান এড়িয়ে বাতাসের পালাবার পথ নেই। এর বাতাসের পরিমাণ অত্যন্ত বেশি বলেই এর গড়পড়তা ওজন আয়তনের তুলনায় এত কম। এর ভিতরের কঠিন অংশের ব্যাস ২৪০০০ মাইল, তার উপরে প্রায় ৬০০০ মাইল বরফ জমেছে, আর তার উপরে আছে ১৬০০০ মাইল হাওয়া।

শনিগ্রহের পরের মণ্ডলীতে আছে য়ুরেনস নামক এক নতুন-পাওয়া গ্রহ।

এ গ্রহ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ কিছু জানা সম্ভব হয় নি। এর আয়তন পৃথিবীর ৬৪ গুণ বেশি। সূর্য থেকে ১৭৮ কোটি ২৮ লক্ষ মাইল দূরে থেকে সেকেণ্ডে চার মাইল বেগে ৮৪ বছরে একবার তাকে প্রদক্ষিণ করে। এত বেড়া এর আয়তন কিন্তু খুব দূরে আছে বলে দুরবীন ছাড়া একে দেখা যায় না। যে জিনিসে এ গ্রহ তৈরি তা জলের চেয়ে একটু ঘন, তাই পৃথিবী থেকে বহু গুণ বড়ো হলেও, এর ওজন পৃথিবীর ১৫ গুণ মাত্র।

১০ ঘন্টা ৪৩ মিনিটে এ গ্রহ একবার ঘুরপাক খাচ্ছে। চারটি উপগ্রহ নিজ নিজ পথে ক্রমাগত একে প্রদক্ষিণ করছে।

য়ুরেনস আবিষ্কারের কিছুকাল পরেই পণ্ডিতেরা য়ুরেনসের বেহিসাবি চলন দেখে স্থির করলেন, এ গ্রহ পথের নিয়ম ভেঙেছে আর একটা কোনো গ্রহের টানে। খুঁজতে খুঁজতে বেরল সেই গ্রহ। তার নামকরণ হল নেপচুন।

সূর্য থেকে এর দূরত্ব ২৭৯ কোটি ৩৫ লক্ষ মাইল; প্রায় ১৬৪ বছরে এ সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে। এর ব্যাস প্রায় ৩৩০০০ মাইল, য়ুরেনসের চেয়ে কিছু বড়ো। দুরবীনে শুধু ছোটো একটি সবুজ থালার মতো দেখায়। একটি উপগ্রহ ২ লক্ষ ২২ হাজার মাইল দূরে থেকে ৫ দিন ২১ ঘন্টায় একে একবার ঘুরে আসছে। উপগ্রহের দূরত্ব এবং এই গ্রহের আয়তন থেকে হিসাব করা হয়েছে যে এর বস্তুপদার্থ জল থেকে কিছু ভারী, ওজনে এ প্রায় য়ুরেনস-এর সমান। কত বেগে এ গ্রহ মেরুদণ্ডের চার দিকে ঘুরছে তা আজও একেবারে ঠিক হয় নি।

নেপচুনের আকর্ষণে য়ুরেনস-এর যে নূতন পথে চলার কথা তা হিসেব করার পরেও দেখা গেল যে য়ুরেনস ঠিক সে পথ ধরেও চলছে না। তার থেকে বোঝা গেল যে নেপচুন ছাড়া এ গ্রহের গতিপথের বাইরে রয়েছে আরো একটা জ্যোতিষ্ক। ১৯৩০ সালে বেরিয়ে পড়ল নূতন এক গ্রহ। তার নাম দেওয়া হল প্লুটো। এ গ্রহ এত ছোটো ও এত দূরে যে দুরবীনেও একে দেখা যায় না। ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলে নিঃসন্দেহে এর অস্তিত্ব প্রমাণ করা হয়েছে। এই গ্রহই সূর্য থেকে সব চেয়ে দূরে, তাই আলো-উত্তাপ পাচ্ছে এত কম যে, এর অবস্থা আমরা কল্পনাও করতে পারি নে।

৩৯৬ কোটি মাইল দূর থেকে প্রায় ২৫০ বছরে এ গ্রহ সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে।

প্লুটো গ্রহটির তাপমাত্র হবে বরফগলা শৈত্যের ৪৪৬ ডিগ্রি ফারেনহাইট পরিমাপের নীচে। এত শীতে অত্যন্ত দুরন্ত গ্যাসও তরল এমন-কি নিরেট হয়ে যায়। আঙ্গারিক গ্যাস, অ্যামোনিয়া, নাইট্রজেন প্রভৃতি বায়ব পদার্থগুলো জমে বরফপিণ্ডে গ্রহটাকে নিশ্চয় ঢেকে

ফেলেছে। কেউ কেউ মনে করেন সৌরলোকের শেষসীমানায় কতকগুলো ছোটো ছোটো গ্রহ ছিটিয়ে আছে, প্লুটো তাদের মধ্যে একটি। কিন্তু এ মতের নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় নি, কখনো যাবে কি না বলা যায় না। এখনকার চেয়ে অনেক প্রবলতর দুরবীন ঐ দূরত্বের যবনিকা তুলতে যদি পারে তা হলেই সংশয়ের সমাধান হবে।

ভূলোক

অন্য গ্রহের আকারের ও চলাফেরার কিছু কিছু খবর জমেছে, কেবল পৃথিবী একমাত্র গ্রহ যার শরীরের গঠনরীতি আমরা পুরোপুরি অনেকটা জানতে পেরেছি। গ্যাসীয় অবস্থা পেরিয়ে যখন থেকে তার দেহ আঁট বেঁধেছে তখন থেকেই সর্বাঙ্গে তার ইতিহাসের নানা সংকেতচিহ্ন আঁকা পড়ছে।

পৃথিবীর উপরকার স্তরে কোনো ঢাকা না থাকাতে সেই ভাগটা শীঘ্র ঠাণ্ডা হয়ে শক্ত হল, আর ভিতরের স্তর ক্রমশ নিরেট হতে থাকল। দুধের সর ঠাণ্ডা হতে হতে যেমন কুঁচকিয়ে যায়, পৃথিবীর উপরকার স্তর ঠাণ্ডা হতে হতে তেমনি কুঁচকিয়ে যেতে লাগল। কুঁচকিয়ে গেলে দুধের সর যেটুকু অসমান হয় সে আমরা গণ্যই করি নে। কিন্তু কুঁচকিয়ে-যাওয়া পৃথিবীর স্তরের অসমানতা তেমন সামান্য ব'লে উড়িয়ে দেবার নয়। নীচের স্তর এই অসমানতার ভার বইবার মতো পাকা হয় নি। তাই ভালো নির্ভর না পাওয়াতে উপরের শক্ত স্তরটা ভেঙে তুবড়ে উঁচুনিচু হতে থাকল, দেখা দিল পাহাড়পর্বত। বুড়ো মানুষের কপালের চামড়া কুঁচকে যেমন বলি পড়ে, তেমনি এগুলো যেন পৃথিবীর উপরকার চামড়ার বলি। সমস্ত পৃথিবীর বৃহৎ গভীরতার তুলনায় এই পাহাড়পর্বত মানুষের চামড়ার উপর বলিচিহ্নের চেয়ে কম বই বেশি নয়।

প্রাচীন যুগের পৃথিবীতে কুঁচকে-যাওয়া স্তরের উঁচুনিচুতে কোথাও নামল গহ্বর, কোথাও উঠল পর্বত। গহ্বরগুলো তখনো জলে ভরতি হয় নি। কেননা তখনো পৃথিবীর তাপে জলও ছিল বাষ্প হয়ে। ক্রমে মাটি হল ঠাণ্ডা, বাষ্প হল জল। সেই জলে গহ্বর ভরে উঠে হল সমুদ্র।

পৃথিবীর অনেকখানি জলের বাষ্প তো তরল হল; কিন্তু হাওয়ার প্রধান গ্যাসগুলো গ্যাসই রয়ে গেল। তাদের তরল করা সহজ নয়। যতটা ঠাণ্ডা হলে তারা তরল হতে পারত

ততটা ঠাণ্ডায় জল যেত জমে, আগাগোড়া পৃথিবী হত বরফের বর্মে আবৃত। মাঝারি পরিমাপের গরমে-ঠাণ্ডায় অক্সিজেন নাইট্রজেন প্রভৃতি বাতাসের গ্যাসীয় জিনিসগুলি চলাফেরা করছে সহজে, আমরা নিশ্বাস নিয়ে বাঁচছি।

পৃথিবীর ভিতরের দিকে সংকোচন এখনো একেবারে থেমে যায় নি। তারই নড়নের ঠেলায় হঠাৎ কোথাও তলার জায়গা যদি নীচে থেকে কিছু সরে যায়, তা হলে উপরের শক্ত আবরণ ভেঙে গিয়ে তার উপরে চাপ দিয়ে পড়ে, দুলিয়ে দেয় পৃথিবীর স্তরকে, ভূমিকম্প জেগে ওঠে। আবার কোনো কোনো জায়গায় ভাঙা আবরণের চাপে নীচের তপ্ত তরল জিনিস উপরে উছলে ওঠে।

পৃথিবীর ভিতরের অবস্থা জানতে গেলে যতটা খুঁড়ে দেখা দরকার এখনো ততটা নীচে পর্যন্ত খোঁড়া হয় নি। কয়লার খোঁজে মানুষ মাটির যতটা নীচে নেমেছে সে এক মাইলের বেশি নয়। তাতে কেবল এই খবরটা পাওয়া গেছে যে, যত পৃথিবীর নীচের দিকে যাওয়া যায় ততই একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় গরম বাড়তে থাকে। এই উত্তাপবৃদ্ধির পরিমাণ সব জায়গায় সমান নয়, স্থানভেদে মাত্রাভেদ ঘটে। এক সময়ে একটা মত চলতি ছিল যে, ভূস্তরটা ভাসছে পৃথিবীর ভিতরকার তাপে-গলা তরল ধাতুর উপরে। এখনকার মত হচ্ছে পৃথিবীটা নিরেট, ভিতরের দিকে তাপের অস্তিত্ব দেখা যায় বটে কিন্তু পৃথিবীর স্তরে যে-সব তেজস্ক্রিয় পদার্থ আছে, যথেষ্ট তাপ পাওয়া যাচ্ছে তাদের থেকে। তার অন্তঃকেন্দ্রের উপাদান লোহার চেয়ে নিবিড়। সম্ভবত সে স্থানটি খুব গরম, কিন্তু এতটা নয় যাতে ভিতরকার জিনিস গলে যেতে পারে। আন্দাজ করা যাচ্ছে সেখানকার জিনিসটা লোহা আর নিকেল, তারা আছে দু'হাজার মাইল জুড়ে, আর তাদের বেড়ে আছে যে একটা খোল সে পুরু দু'হাজার মাইলের উপরে।

পৃথিবীর সমস্তটাই যদি জলময় হত তা হলে তার ওজন যতটা হত জলে স্থলে মিশিয়ে তার চেয়ে তার ওজন সাড়ে-পাঁচগুণ বেশি। তার উপরকার তলার পাথর জলের চেয়ে তিনগুণ বেশি ঘন। তা হলে তার ভিতরে আরো বেশি ভারী জিনিস আছে ধরে নিতে

হবে। কেবল যে উপরকার চাপেই তাদের ঘনত্ব বেড়ে গেছে তা নয় সেখানকার বস্তুপুঞ্জের ভার স্বভাবতই বেশি।

পৃথিবীকে ঘিরে আছে যে বাতাস তার শতকরা ৭৮ ভাগ নাইট্রজেন, ২১ ভাগ অক্সিজেন। আর আর যে-সব গ্যাস আছে সে অতি সামান্য। অক্সিজেন গ্যাস মিশুক গ্যাস, লোহার সঙ্গে মিশে মর্চে ধরায়, অঙ্গারপদার্থের সঙ্গে মিশে আগুন জ্বালায় – এমনি করে বায়ুমণ্ডল থেকে নিয়ত তার অনেক খরচ হতে থাকে। এ দিকে গাছপালারা বাতাসের অঙ্গারাম্ল গ্যাসের থেকে নিজের প্রয়োজন অঙ্গার আদায় করে নিয়ে অক্সিজেন-ভাগ বাতাসকে ফিরিয়ে দেয়। এ না হলে পৃথিবীর হাওয়া অঙ্গারাম্ল গ্যাসে ভরে যেত, মানুষ পেত না তার নিশ্বাসের বায়ু।

আকাশের অনেকটা উঁচু পর্যন্ত হাওয়ার বেশি পরিবর্তন হয় নি। যে-সব গ্যাস মিশিয়ে হাওয়া তৈরি তাদের অনেকটাই আরো অনেক উঁচুতে পৌঁছয় না। খুব সম্ভব সব চেয়ে হালকা দুটো গ্যাস অর্থাৎ হীলিয়ম এবং হাইড্রজেনে মিশনো সেখানকার হাওয়া।

বাতাসের ঘনত্ব কমতে কমতে ক্রমশই বাতাস অনেক ঊর্ধ্বে উঠে গিয়েছে। বাহির থেকে পৃথিবীতে যে উল্কাপাত হয় পৃথিবীর হাওয়ার ঘর্ষণে তা জ্বলে ওঠে, তাদের অনেকেরই এই জ্বলন প্রথম দেখা দেয় ১২০ মাইল উপরে। ধরে নিতে হবে তার ঊর্ধ্বে আরো অনেকখানি বাতাস আছে যার ভিতর দিয়ে আসতে আসতে তবে এই জ্বলনের অবস্থা ঘটে।

সূর্যের আলো নয় কোটি মাইল পেরিয়ে আসে পৃথিবীতে। গ্রহবেষ্টনকারী আকাশের শূন্যতা পার হয়ে আসতে তেজের বেশি ক্ষয় হবার কথা নয়। যে প্রচণ্ড তেজ নিয়ে সে বায়ুমণ্ডলের প্রত্যন্ত দেশে পৌঁছয় আর আঘাতে সেখানকার হাওয়ার পরমাণু নিশ্চয়ই ভেঙেচুরে ছারখার হয়ে যায় – কেউ আস্ত থাকে না। বাতাসের সর্বোচ্চ ভাগে ভাঙা পরমাণুর যে স্তরের সৃষ্টি হয় তাকে নাম দেওয়া হয় (□ □) এফ ২ স্তর।

সেখানকার খরচের পর বাকি সূর্যকিরণ নীচের ঘনতর বায়ুমণ্ডলকে আক্রমণ করে, সেখানেও পরমাণুভাঙা যে স্তরের উদ্ভব হয় তার নাম দেওয়া হয়েছে (□ □) এফ ১ স্তর।

আরো নীচে আরো ঘন বাতাসে সূর্যকিরণের আঘাতে পঙ্গু পরমাণুর আরো একটা যে স্তর দেখা দেয়, তার নাম (□) ই স্তর।

সূর্যকিরণের বেগনি-পারের রশ্মি পরমাণু-ভাঙচুরের কাজে সব চেয়ে প্রধান উদ্যোগী। উচ্চতর স্তরে উপদ্রব শেষ করতে করতে বেগনি-পারের রশ্মি অনেকখানি নিঃস্ব হয়ে নীচের হাওয়ায় অল্প পৌঁছয়। সেটা আমাদের রক্ষে। বেশি হলে সইত না।

সূর্যকিরণ ছাড়া আরো অনেক কালাপাহাড় দূর থেকে আসে বাতাসকে অদৃশ্য গদাঘাত করতে। যেমন উল্কা, তাদের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এরা ছুটে আসে গ্রহ-আকাশের ভিতর দিয়ে এক সেকেণ্ডে দশ থেকে একশো মাইল বেগে। হাওয়ার ঘর্ষণে তাদের মধ্যে তাপ জেগে ওঠে, তার মাত্রা হয় তিন হাজার থেকে সাত হাজার ফারেনহাইট ডিগ্রি পর্যন্ত; তাতে করে বেগনি-পারের আলোর তীক্ষ্ণ বাণ তূণমুক্ত হয়ে আসে, বাতাসের অণুগুলোর গায়ে প'ড়ে তাদের জ্বালিয়ে চুরমার করে দেয়। এছাড়া আর-এক রশ্মিবর্ষণের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। সে কস্‌মিক রশ্মি। বিশ্বে সে-ই হচ্ছে সব চেয়ে প্রবল শক্তির বাহন।

পৃথিবীর বাতাসে আছে অক্সিজেন নাইট্রজেন প্রভৃতি গ্যাসের কোটি কোটি অণুকণা, তাঁরা অতি দ্রুতবেগে ক্রমাগতই ঘোরাঘুরি করছে, পরস্পরের মধ্যে সংঘাত চলছেই। যারা হালকা কণা তাদের দৌড় বেশি। সমগ্র দলের যে বেগ তার চেয়ে স্বতন্ত্র ছুটকো অণুর বেগ অনেক বেশি। সেইজন্যে পৃথিবীর বাহির আঙিনার সীমা থেকে হাইড্রজেনের খুচরো অণু প্রায়ই পৃথিবীর টান কাটিয়ে বাইরে দৌড় দিচ্ছে। কিন্তু দলের বাইরে অক্সিজেন

নাইট্রজেনের অণুকণার গতি কখনো ধৈর্যহারা পলাতকার বেগ পায় না। সেই কারণে পৃথিবীর বাতাসে তাদের দৈন্য ঘটে নি; কেবল তরুণ বয়সে যে হাইড্রজেন ছিল পৃথিবীর সব চেয়ে প্রধান গ্যাসীয় সম্পত্তি, ক্রমে ক্রমে সেটার অনেকখানিই সে খুইয়ে ফেলেছে।

বড়ো বড়ো ডানাওয়ালা পাখি শুধু ডানা ছড়িয়েই অনেকক্ষণ ধরে হাওয়ার উপরে ভেসে বেড়ায়, বুঝতে পারি পাখিকে নির্ভর দিতে পারে এতটা ঘনতা আছে বাতাসের। বস্তুত কঠিন ও তরল জিনিসের মতোই হাওয়ারও ওজন মেলে। আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত হাওয়া আছে অনেক মাইল ধরে। সেই হাওয়ার চাপ এক ফুট লম্বা ও এক ফুট চওড়া জিনিসের উপর প্রায় সাতাশ মণ। একজন সাধারণ মানুষের শরীরে চাপ পড়ে প্রায় ৪০০ মণের উপর। তবুও তা টের পাই নে। যেমন উপর থেকে তেমনি নীচের থেকে, আবার আমাদের শরীরের মধ্যে যে হাওয়া আছে তার থেকে সমানভাবে বাতাসের চাপ আর ঠেলা লাগছে ব'লে বাতাসের ভার আমাদের পীড়া দিচ্ছে না।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল আপন আবরণে দিনের বেলায় সূর্যের তাপ অনেকটা ঠেকিয়ে রাখে, আর রাত্রিতে মহাশূন্যে প্রবল ঠাণ্ডাটাকেও বাধা দেয়। চাঁদের গায়ে হাওয়ার উড়ুনি নেই তাই সে সূর্যের তাপে ফুটন্ত জলের সমান গরম হয়ে ওঠে। অথচ গ্রহণের সময় যখনই পৃথিবী চাঁদের উপর ছায়া ফেলে অমনি দেখতে দেখতেই সে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। হাওয়া থাকলে থাকলে তাপটাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারত। চাঁদের কেবল এইমাত্র ত্রুটি নয়, বাতাস নেই বলে সে একেবারে বোবা, কোথাও একটু শব্দ হবার জো নেই। বিশেষভাবে নাড়া পেলে বাতাসে নানা আয়তনের সূক্ষ্ম ঢেউ ওঠে, সেইগুলো নানা কাঁপনের ঘা দেয় আমাদের কানের ভিতরকার পাতলা চামড়ায়, তখন সেই-সব ঢেউ নানারকম আওয়াজ হয়ে আমাদের কাছে সাড়া দিতে থাকে। আরো একটি কাজ আছে বাতাসের। কোনো কারণে রৌদ্র যেখানে কিছু বাধা পায় সেখানে ছায়াতেও যথেষ্ট আলো থাকে, এই আলো বিছিয়ে দেয় বাতাস। নইলে যেখানটিতে রোদ পড়তে কেবল সেইখানেই আলো হত। ছায়া ব'লে কিছুই থাকত না। তীব্র আলোর ঠিক পাশেই থাকত ঘোর অন্ধকার। গাছের মাথার উপর রোদ্‌দুর উঠত চোখ রাঙিয়ে আর তার তলা হত

মিশমিশে কালো, ঘরের ছাদে ঝাঁ ঝাঁ করত দুইপহরে রোদের তেজ, ঘরের ভিতর থাকত দুইপহরের অমাবস্যার রাত্রি। প্রদীপ জ্বালার কথা চিন্তা করাই হত মিথ্যে, কেননা পৃথিবীর বাতাসে অক্সিজেন গ্যাসের সাহায্যে সব-কিছু জ্বলে।

গাছের সবুজ পাতায় থাকে গোলাকার অণুপদার্থ, তাদের মধ্যে ক্লরফিল বলে একটি পদার্থ আছে – তারাই সূর্যের আলো জমা করে রাখে গাছের নানা বস্তুতে। তাদের শক্তিতেই তৈরি হচ্ছে ফলে-ফসলে আমাদের খাদ্য, আর গাছের ডালাতে গুঁড়ির কাঠ। পৃথিবীর বাতাসে আছে অঙ্গারাক্সিজেনী গ্যাস সামান্য পরিমাণে। উদ্ভিদবস্তুতে যত অঙ্গার পদার্থ আছে, যার থেকে কয়লা হয়, সমস্ত এই গ্যাস থেকে নেওয়া। এই অক্সিজেনী-আঙ্গারিক গ্যাস মানুষের দেহে কেবল যে কাজে লাগে না তা নয়, একে শরীর থেকে বের করে দিতে না পারলে আমরা মারা পড়ি। কিন্তু গাছ আপন ক্লরফিলের যোগে এই অক্সিজেনী আঙ্গারিককেও জলে মিশিয়ে ধানে গমে আমাদের জন্য যে খাবার বানিয়ে তোলে সেই খাদ্যের ভিতর দিয়ে সূর্যতাপের শক্তিকে আমরা প্রাণের কাজে লাগাতে পারি। এই শক্তিকে আকাশ থেকে নেবার ক্ষমতা আমাদের নেই, গাছের আছে। গাছের থেকে আমরা নিই ধার করে। পৃথিবীতে সমস্ত জন্তুরা মিলে যে অক্সিজেন-মিশ্রিত আঙ্গারিক বাষ্প নিশ্বাসের সঙ্গে বের করে দেয় সেটা লাগে গাছপালার প্রয়োজনে। আগুন-জ্বালানি থেকে, উদ্ভিদ ও জন্তুদেহের পচানি থেকেও এই বাষ্প বাতাসে ছড়াতে থাকে। পৃথিবীতে কলকারখানায় রান্নার কাজে কয়লা যা পোড়ানো হয় সে বড়ো কম নয়। তার থেকে উদ্ভব হয় বহু কোটি মণ অঙ্গারাক্সিজেনী গ্যাস। গাছের পক্ষে যে হাওয়ার ভোজের দরকার সেটা এমনি করে জুটতে থাকে ত্যাজ্য পদার্থ থেকে।

বাতাসকে মৌলিক পদার্থ বলা চলে না, ওটা মিশল জিনিস। তাতে মিশেছে নানা গ্যাস কিন্তু মেলে নি, একত্রে আছে, এক হয় নি। বাতাসে যে পরিমাণ অক্সিজেন তার প্রায় চার গুণ আছে নাইট্রেজেন। কেবলমাত্র নাইট্রোজেন থাকলে দম আটকিয়ে মরে যেতুম। কেবলমাত্র অক্সিজেনে আমাদের প্রাণবস্তু পুড়ে পুড়ে শেষ হয়ে যেত। এই প্রাণবস্তু

কিছু পরিমাণ জ্বলে, আবার জ্বলতে কিছু পরিমাণ বাধা পায়, তবেই আমরা দুই বাড়াবাড়ির মাঝখানে থেকে বাঁচতে পারি।

সমস্ত বায়ুমণ্ডল জলে স্যাঁতসেঁতে। যে জল থাকে মেঘে, তার চেয়ে অনেক বেশি জল আছে হাওয়ায়।

উপরকার বায়ুমণ্ডলে ভাঙা পরমাণুর বৈদ্যুতস্তরের কথা পূর্বে বলেছি। সে ছাড়া সহজ বাতাসের দুটো স্তর আছে। এর যে প্রথম থাকটা পৃথিবীর সব চেয়ে কাছে তার বৈজ্ঞানিক নাম □□□□□□□□□□□, বাংলায় একে ক্ষুব্ধস্তর বলা যেতে পারে। পাঁচ থেকে দশ মাইলের বেশি এর চড়াই নয়। সমগ্র বায়ুমণ্ডলের মাপে এই ক্ষুব্ধস্তরের উচ্চতা খুবই কম, কিন্তু এইটুকুর মধ্যেই আছে বাতাসের সমস্ত পদার্থের প্রায় ৯০ ভাগ। কাজেই অন্য স্তরের চেয়ে এ স্তর অনেক বেশি ঘন। পৃথিবীর একেবারে গায়ে লেগে আছে ব'লে এই স্তরে সর্বদা পৃথিবীর উত্তাপের ছোঁয়াচ লাগে। সেই উত্তাপের কমায়-বাড়ায় হাওয়া ক্রমাগত ছুটোছুটি করে। এই স্তরেই তাই ঝড়বৃষ্টি। এর আরো উপরে যে স্তর পৃথিবীর তাপ সেখানে ঝড়তুফান চালান করতে পারে না। তাই সেখানকার হাওয়া শান্ত। পণ্ডিতেরা এ স্তরের নাম দিয়েছেন □□□□□□□□□□□□, বাংলায় আমরা বলব স্তব্ধস্তর।

আদি সূর্য থেকে যেমন পৃথিবী বেরিয়ে এসেছে তেমনি বাষ্পদেহী আদিম পৃথিবী থেকে বেরিয়ে এসেছে চাঁদ। তার পরে কোটি কোটি বৎসরে পৃথিবী ঠাণ্ডা হয়ে শক্ত হল, চাঁদও হল তাই।

২ লক্ষ ৩৯ হাজার মাইল দূরে থেকে ২৭ ১/৩ দিনে চাঁদ পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করছে। সেই প্রদক্ষিণের কালে কেবল একটা পিঠ পৃথিবীর দিকে ফিরিয়ে রেখেছে। এর ব্যাস প্রায় ২১৬০ মাইল, এর উপাদান জল থেকে ৩ ১/২ গুণ ভারী। অন্যান্য গ্রহনক্ষত্রের তুলনায় পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব খুবই কম ব'লে একে এত উজ্জ্বল ও আয়তনে এত বড়ো

দেখায়। আশিটি চাঁদ একসঙ্গে ওজন করলে পৃথিবীর ওজনের সমান হবে। দুরবীনে চাঁদকে দেখলে স্পষ্টই বোঝা যায় পৃথিবীর মতোই শক্ত জিনিসে ঐ তৈরি। ওর উপরে আছে বড়ো বড়ো গহ্বর আর বড়ো বড়ো পাহাড়।

পৃথিবীর টানে চন্দ্র পৃথিবীর চার দিকে ঘুরছে। এক পাক ঘুরতে তার এক মাসের কিছু কম লাগে। গড়পড়তায় তার গতিবেগ এক সেকেণ্ডে আধ মাইলের বেশি নয়। পৃথিবী ঘোরে সেকেণ্ডে উনিশ মাইল। আপন মেরুদণ্ডের চার দিকে ঘুরতে চাঁদের এক মাসের সমানই লাগে। তার দিন আর বৎসর চলে একই রকম ধীরমন্দ চালে।

চাঁদের ওজন থেকে হিসেব করা হয়েছে যে কোনো জিনিসের গতিবেগ যদি সেখানে সেকেণ্ডে ১ ১/২ মাইল হয় তা হলে চাঁদের টান অগ্রাহ্য করে তা ছুটে বাইরে যেতে পারে। চাঁদ যে নিয়মে অতিমাত্রায় রোদ পোহায় তাতে তার তেতে-ওঠা পিঠের উপরে হাওয়া অত্যন্ত গরম হয়ে ওঠাতে চাঁদ তার বাতাসের অণুদের ধরে রাখতে পারে নি, তারা সবাই গেছে বেরিয়ে। যেখানে হাওয়ার চাপ নেই সেখানে জল খুব তাড়াতড়ি বাষ্প হয়ে যায়। বাষ্প হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জলের অণু গরমে চঞ্চল হয়ে চাঁদের বাঁধন ছাড়িয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। জল-হাওয়া যেখানে নেই সেখানে কোনো রকমের প্রাণ টিঁকতে পারে বলে আমরা জানি নে। চাঁদকে একটা তালপাকানো মরুভূমি বলা যেতে পারে।

রাতের বেলায় যাদের আমরা খসে-পড়া তারা বলি সেগুলো যে তারা নয় তা আজ আর কাউকে বলতে হবে না। সেই উল্কাপিণ্ডগুলো পৃথিবীর টানে দিনরাত লাখো লাখো পড়ছে পৃথিবীর উপর। তার অধিকাংশই বাতাসের ঘেঁষ লেগে জ্বলে উঠে ছাই হয়ে যাচ্ছে। যেগুলো বড়ো আয়তনের, তারা জ্বলতে জ্বলতে মাটিতে এসে পৌঁছয়, বোমার মতো যায় ফেটে, চার দিকে যা পায় দেয় ছারখার করে।

চাঁদেও ক্রমাগত এই উল্কাবৃষ্টি হচ্ছে। ওদের ঠেকিয়ে ছাই করে দেবার মতো একটু হাওয়া নেই, অবাধে ওরা ঢেলা মারছে চাঁদের সর্বাঙ্গে। বেগ কম নয়, সেকেণ্ডে প্রায় ত্রিশ মাইল, সুতরাং ঘা মারে সর্বনেশে জোরে।

চাঁদে বড়ো বড়ো গর্তের উৎপত্তি একদা-উৎসারিত অগ্নি-উৎস থেকেই। যে গলন্তপদার্থ ও ছাই তখন বেরিয়ে এসেছিল, হাওয়া-জল না থাকায় এতযুগ ধরেও তাদের কোনো বদল হতে পারে নি। ছাইঢাকা আছে ব'লে সূর্যের আলো এই আবরণ ভেদ করে খুব বেশি নীচে যেতে পারে না, আর নীচের উত্তাপও উপরে আসতে পারে না।

চাঁদের যেদিকে সূর্যের আলো পড়ে তার উত্তাপ প্রায় ফুটন্ত জলের সমান, আর যেখানে আলো পড়ে না তা এত ঠাণ্ডা যে বরফের শৈত্যের চেয়ে তা প্রায় ২৫০ ফারেনহাইট ডিগ্রি নীচে থাকে। চন্দ্রগ্রহণের সময় পৃথিবীর ছায়া এসে যখন চাঁদের উপরে পড়ে তখন তার উত্তাপ কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রায় ৩৪৬ ডিগ্রি ফারেনহাইট কমে যায়।

হাওয়া না থাকায় ও ছাইয়ের আবরণ থাকায় সূর্যের আলো নীচে প্রবেশ করতে পারে না ব'লে সঞ্চিত কোনো উত্তাপই চাঁদে নেই; তাই এত তাড়াতাড়ি এর উত্তাপ কমে আসে। এ-সব প্রমাণ থেকে বলা যায় যে, আগ্নেয়গিরির ছাই ঢেকে রেখেছে চাঁদের প্রায় সব জায়গা।

চাঁদ পৃথিবীর কাছের উপগ্রহ। তার টানের জোর প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করি পৃথিবীর সমুদ্রগুলোতে, সেখানে জোয়ারভাঁটা খেলতে থাকে; আর শুনেছি আমাদের শরীরের জ্বরজারি বাতের ব্যথাও ঐ টানের জোরে জেগে ওঠে। বাতের রোগীরা ভয় করে অমাবস্যা-পূর্ণিমাকে।

আদিকালে পৃথিবীতে জীবনের কোনো চিহ্নই ছিল না। প্রায় সত্তর-আশি কোটি বছর ধরে চলেছিল নানা আকারে তেজের উৎপাত; কোথাও অগ্নিগিরি ফুঁসছে তপ্ত বাষ্প। উগরে

দিচ্ছে তরল ধাতু, ফোয়ারা ছোটাচ্ছে গরম জলের। নীচের থেকে ঠেলা খেয়ে কাঁপছে ফাটছে ভূমিতল, উঠে পড়ছে পাহাড়পর্বত, তলিয়ে যাচ্ছে ভূখণ্ড।

পৃথিবীর শুরু থেকে প্রায় দেড়শো কোটি বছর যখন পার হল অশান্ত আদিযুগের মাথা-কুটে-মরা অনেকটা তেমেছে। এমন সময়ে সৃষ্টির সকলের চেয়ে আশ্চর্য ঘটনা দেখা দিল। কেমন করে কোথা থেকে প্রাণের ও তার পরে ক্রমশ মনের উদ্‌ভব হল তার ঠিকানা পাওয়া যায় না। তার আগে পৃতিবীতে সৃষ্টির কারখানাঘরে তোলাপাড়া ভাঙাগড়া চলছিল প্রাণহীন পদার্থ নিয়ে। তার উপকরণ ছিল মাটি জল, লোহা পাথর প্রভৃতি; আর সঙ্গে সঙ্গে ছিল অক্সিজেন, হাইড্রজেন, নাইট্রজেন প্রভৃতি কতকগুলি গ্যাস। নানা রকমের প্রচণ্ড আঘাতে তাদেরই উলটপালট করে জোড়াতাড়া দিয়ে নদী-পাহাড়-সমুদ্রের রচনা ও অদলবদল চলছিল। এমন সময়ে এই বিরাট জীবহীনতার মধ্যে দেখা দিল প্রাণ, আর তার সঙ্গে মন। এদের পূর্ববর্তী পদার্থরাশির সঙ্গে এর কোনোই মিল নেই।

নক্ষত্রদের প্রথম আরম্ভ নীহারিকায় তেমনি পৃথিবীতে জীবলোকে প্রথম যা প্রকাশ পেল তাকে বলা যেতে পারে প্রাণের নীহারিকা। সে একরকম অপরিস্ফুট ছড়িয়ে-পড়া প্রাণপদার্থ, ঘন লালার মতো অঙ্গবিভাগহীন – তখনকার ঈষৎ-গরম সমুদ্রজলে ভেসে বেড়াত। তার নাম দেওয়া হয়েছে প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌। যেমন নক্ষত্র দানা বেঁধে ওঠে আগ্নেয় বাষ্পে, তেমনি বহু যুগ লাগল এর মধ্যে মধ্যে একটি একটি পিণ্ড জমতে। সেইগুলির এক শ্রেণীর নাম দেওয়া হয়েছে অমীবা; আকারে অতি ছোটো; অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখা যায়। পঙ্কিল জলের ভিতর থেকে এদের পাওয়া যেতে পারে। এদের মুখ চক্ষু হাত পা নেই। আহারের খোঁজে ঘুরে বেড়ায়। দেহপিণ্ডের এক অংশ প্রসারিত করে দিয়ে পায়ের কাজ করিয়ে নেয়। খাবারের সম্পর্কে এলে সেই সাময়িক পা দিয়েই টেনে নেয়। পাকযন্ত্র বানিয়ে নেয় দেহের একটা অংশে। নিজের সমস্ত দেহটাকে ভাগ করে তার বংশবৃদ্ধি হয়। এই অমীবারই আর-এক শাখা দেখা দিল, তারা দেহের চারি দিকে আবরণ বানিয়ে তুললে, শামুকের মতো। সমুদ্রে আছে এদের কোটি কোটি সূক্ষ্ম দেহ। এদের এই দেহপঙ্ক জমে জমে পৃথিবীর স্থানে স্থানে খড়িমাটির পাহাড় তৈরি হয়েছে।

বিশ্বরচনার মূলতম উপকরণ পরমাণু; সেই পরমাণুগুলি অচিন্তনীয় বিশেষ নিয়মে অতিসূক্ষ্ম জীবকোষরূপে সংহত হল। প্রত্যেক কোষটি সম্পূর্ণ এবং স্বতন্ত্র, তাদের প্রত্যেকের নিজের ভিতরেই একটা আশ্চর্য শক্তি আছে যাতে করে বাইরে থেকে খাদ্য নিয়ে নিজেকে পুষ্ট, অনাবশ্যককে ত্যাগ ও নিজেকে বহুগুণিত করতে পারে। এই বহুগুণিত করার শক্তি দ্বারা ক্ষয়ের ভিতর দিয়ে মৃত্যুর ভিতর দিয়ে প্রাণের ধারা প্রবাহিত হয়ে চলে।

এই জীবাণুকোষ প্রাণলোকে প্রথমে একলা হয়ে দেখা দিয়েছে। তার পরে এরা যত সংঘবদ্ধ হতে থাকল ততই জীবজগতে উৎকর্ষ ও বৈচিত্র্য ঘটতে লাগল। যেমন বহুকোটি তারার সমবায়ে একটি নীহারিকা তেমনি বহুকোটি জীবকোষের সমাবেশে এক-একটি দেহ। বংশাবলীর ভিতর দিয়ে এই দেহজগৎ একটি প্রবাহ সৃষ্টি ক'রে নূতন নূতন রূপের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়ে চলেছে। আমরা এত কাল নক্ষত্রলোক সূর্যলোকের কথা আলোচনা করে এসেছি। তার চেয়ে বহুগুণ বেশি আশ্চর্য এই প্রাণলোক। উদ্দাম তেজকে শান্ত করে দিয়ে ক্ষুদ্রায়তন গ্রহরূপে পৃথিবী যে অনতি-ক্ষুব্ধ পরিণতি লাভ করেছে সেই অবস্থাতেই প্রাণ এবং তার সহচর মন-এর আবির্ভাব সম্ভবপর হয়েছে এ কথা যখন চিন্তা করি তখন স্বীকার করতেই হবে জগতে এই পরিণতিই শ্রেষ্ঠ পরিণতি। যদিও প্রমাণ নেই এবং প্রমাণ পাওয়া আপাতত অসম্ভব তবু এ কথা মানতে মন চায় না যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এই জীবনধারণযোগ্য চৈতন্যপ্রকাশক অবস্থা একমাত্র এই পৃথিবীতেই ঘটেছে; যে, এই হিসাবে পৃথিবী সমস্ত জগৎধারার একমাত্র ব্যতিক্রম।

উপসংহার

একদা জগতের সকলের চেয়ে মহাশ্চর্য বার্তা বহন করে বহুকোটি বৎসর পূর্বে তরুণ পৃথিবীতে দেখা দিল আমাদের চক্ষুর অদৃশ্য একটি জীবকোষের কণা। কী মহিমার ইতিহাস সে এনেছি কত গোপনে। দেহে দেহে অপরূপ শিল্পসম্পদশালী তার সৃষ্টিকার্য নব নব পরীক্ষার ভিতর দিয়ে অনবরত চলে আসছে। যোজনা করবার, শোধন করবার, অতি জটিল কর্মতন্ত্র উদ্‌ভাবন ও চালনা করবার বুদ্ধি প্রচ্ছন্নভাবে তাদের মধ্যে কোথায় আছে, কেমন করে তাদের ভিতর দিয়ে নিজেকে সক্রিয় করেছে, উত্তরোত্তর অভিজ্ঞতা জমিয়ে তুলছে ভেবে তার কিনারা পাওয়া যায় না। অতি-পেলববেদনাশীল জীবকোষগুলি বংশাবলীক্রমে যথাযথ পথে সমষ্টি বাঁধছে জীবদেহে, নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গে; নিজের ভিতরকার উদ্যমে জানি না কী করে দেহক্রিয়ার এমন আশ্চর্য কর্তব্যবিভাগ করছে। যে কোষ পাকযন্ত্রের, তার কাজ এক রকমের, যে কোষ মস্তিষ্কের, তার কাজ একেবারেই অন্য রকমের। অথচ জীবাণুকোষগুলি মূলে একই। এদের দুরূহ কাজের ভাগ-বাঁটোয়ারা হল কোন্‌ হুকুমে এবং এদের বিচিত্র কাজের মিলন ঘটিয়ে স্বাস্থ্য নামে একটা সামঞ্জস্য সাধন করল কিসে। জীবাণুকোষের দুটি প্রধান ক্রিয়া আছে, বাইরে থেকে খাবার জুগিয়ে বাঁচা ও বাড়তে থাকা, আর নিজের অনুরূপ জীবনকে উৎপন্ন করে বংশধারা চালিয়ে যাওয়া। এই আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষার জটিল প্রয়াস গোড়াতেই এদের উপর ভর করল কোথা থেকে।

অপ্রাণ বিশ্বে যে-সব ঘটনা ঘটছে তার পিছনে আছে সমগ্র জড়জগতের ভূমিকা। মন এই-সব ঘটনা জানছে, এই জানার পিছনে মনের একটা বিশ্বভূমিকা কোথায়। পাথর লোহা গ্যাসে নিজের মধ্যে তো জানার সম্পর্ক নেই। এই দুঃসাধ্য প্রশ্ন নিয়ে বিশেষ একটা যুগে প্রাণ মন এল পৃথিবীতে – অতিক্ষুদ্র জীবকোষকে বাহন ক'রে।

পৃথিবীতে সৃষ্টি-ইতিহাসে এদের আবির্ভাব অভাবনীয়। কিন্তু সকল-কিছুর সঙ্গে সম্বন্ধহীন একান্ত আকস্মিক কোনো অভ্যুৎপাতকে আমাদের বুদ্ধি মানতে চায় না। আমরা জড়বিশ্বের সঙ্গে মনোবিশ্বের মূলগত ঐক্য কল্পনা করতে পারি সর্বব্যাপী তেজ বা জ্যোতিঃ-পদার্থের মধ্যে। অনেক কাল পরে বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে যে আপাত-দৃষ্টিতে যে-সকল স্থূল পদার্থ জ্যোতির্হীন, তাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন-আকারে নিত্যই জ্যোতির ক্রিয়া চলছে। এই মহাজ্যোতিরই সূক্ষ্ম বিকাশ প্রাণে এবং আরো সূক্ষ্মতর বিকাশ চৈতন্যে ও মনে। বিশ্বসৃষ্টির আদিতে মহাজ্যোতি ছাড়া আর কিছুই যখন পাওয়া যায় না, তখন বলা যেতে পারে চৈতন্যে তারই প্রকাশ। জড় থেকে জীবে একে একে পর্দা উঠে মানুষের মধ্যে এই মহাচৈতন্যের আবরণ ঘোচাবার সাধনা চলেছে। চৈতন্যের এই মুক্তির অভিব্যক্তিই বোধ করি সৃষ্টির শেষ পরিণাম।

পণ্ডিতেরা বলেন, বিশ্বজগতের আয়ু ক্রমাগতই ক্ষয় হচ্ছে এ কথা চাপা দিয়ে রাখা চলে না। মানুষের দেহের মতোই তাপ নিয়ে জগতের দেহের শক্তি। তাপের ধর্মই হচ্ছে যে খরচ হতে হতে ক্রমশই নেমে যায় তার উষ্মা। সূর্যের উপরিতলের স্তরে যে তাপশক্তি আছে তার মাত্রা হচ্ছে শূণ্য ডিগ্রির উপরে ছয় হাজার সেন্টিগ্রেড। তারই কিছু কিছু অংশ নিয়ে পৃথিবীতে বাতাস চলছে, জল পড়ছে, প্রাণের উদ্যমে জীবজন্তু চলাফেরা করছে। সঞ্চয় তো ফুরোচ্ছে, একদিন তাপের শক্তি মহাশূণ্যে ব্যাপ্ত হয়ে গেলে আবার তাকে টেনে নিয়ে এনে রূপ দেবার যোগ্য করবে কে। একদিন আমাদের দেহের সদাচঞ্চল তাপশক্তি চারি দিকের সঙ্গে একাকার হয়ে যখন মিলে যায়, তখন কেউ তো তাকে জীবযাত্রায় ফিরিয়ে আনতে পারে না। জগতে যা ঘটছে, যা চলছে, পিঁপড়ের চলা থেকে আকাশে নক্ষত্রের দৌড় পর্যন্ত, সমস্তই তো বিশ্বের হিসাবের খাতায় খরচের অঙ্ক ফেলে চলেছে। সে সময়টা যত দূরেই হোক একদিন বিশ্বের নিত্যখরচের তহবিল থেকে তার তাপের সম্বল ছড়িয়ে পড়বে শূণ্যে। এই নিয়ে বিজ্ঞানী গণিতবেত্তা বিশ্বের মৃত্যুকালের গণনায় বলেছিল।

আমার মনে এই প্রশ্ন ওঠে, সূর্য নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্কের আরম্ভকালের কথাও তো দেখি অঙ্ক পেতে পণ্ডিতেরা নির্দিষ্ট করে থাকেন। অসীমের মধ্যে কোথা থেকে আরম্ভ হল। অসীমের মধ্যে একান্ত আদি এ একান্ত অন্তের অবিশ্বাস্য তর্ক চুকে যায় যদি মেনে নিই আমাদের শাস্ত্রে যা বলে, অর্থাৎ কল্পে কল্পান্তরে সৃষ্টি হচ্ছে, আর বিলীন হচ্ছে,ঘুম আর ঘুম-ভাঙার মতো।

সৌরলোকের বিভিন্ন জ্যোতিষ্কের গতি ও অবস্থিতির ভিতর রয়েছে একটা বিরাট শৃঙ্খলা; বিভিন্ন গ্রহ, চক্রপথে প্রায় একই সমক্ষেত্রে থেকে, একটা ঘূর্ণিটানের আবর্তে ধরা প'ড়ে একই দিকে চ'লে সূর্যপ্রদক্ষিণের পালা শেষ করছে। সৃষ্টির গোড়ার কথা যাঁরা ভেবেছেন তাঁরা এতগুলি তথ্যের মিলকে আকস্মিক ব'লে মেনে নিতে পারেন নি। যে মতবাদ গ্রহলোকের এই শৃঙ্খলার সুস্পষ্ট কারণ নির্দেশ করতে পেরেছে তা-ই প্রাধান্য পেয়েছে সব চেয়ে বেশি। যে-সব বস্তুসংঘ নিয়ে সৌরমণ্ডলীর সৃষ্টি তাদের ঘূর্ণিবেগের মাত্রার হিসাব একটা প্রবল অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে এ-সব মতবাদকে গ্রহণযোগ্য করার পক্ষে। হিসাবের গরমিল যেখানে মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে সেই মতকেই দিতে হয়েছে বাতিল করে। ঘূর্ণিবেগের মাত্রা প্রায় ঠিক রেখে যে দু-একটি মতবাদ এত কাল টিঁকে ছিল তাদের বিরুদ্ধেও নূতন বিঘ্ন এসে উপস্থিত হয়েছে। আমেরিকার প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের মানমন্দিরের ডিরেক্টর হেনরি নরিস রাসেল সম্প্রতি জীন্‌স ও লিট্‌লটনের মতবাদের যে বিরুদ্ধসমালোচনা করেছেন তাতে মনে হয় কিছুদিনের মধ্যেই এদেরও বিদায় নিতে হবে গ্রহণযোগ্য মতবাদের পর্যায় থেকে, পূর্ববর্তী বাতিল-করাদের পাশেই হবে এদের স্থান। নক্ষত্রদের সংঘাতে গ্রহ-লোকের সৃষ্টি হলে জ্বলন্ত গ্যাসের যে টানাসূত্র বের হয়ে আসত তার তাপমাত্রা এত বেশি হত যে এই বাষ্পপিণ্ডের বিভিন্ন অংশ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত। কিন্তু অতিদ্রুত তাপ ছড়িয়ে দিয়ে এই টানাসূত্র ঠাণ্ডা হয়ে একটা স্থিতি পেতে চাইত; এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির ক্রিয়ায়, মুক্তি আর বন্ধনের টানাটানিতে কার জিত হবে তাই নিয়েই হেনরি রাসেল আলোচনা করেছেন। আমাদের কাছে দুর্বোধ্য গণিতশাস্ত্রের হিসাব থেকে মোটামুটি প্রমাণ হয়েছে যে টানাসূত্রের প্রত্যেকটি পরমাণু তেজের প্রবল অভিঘাতে বিবাগী হয়ে মহাশূণ্যে বেরিয়ে পড়ত, জমাট বেঁধে গ্রহলোক সৃষ্টি করা তাদের পক্ষে সম্ভব

হত না। যে বাধার কথা তিনি আলোচনা করেছেন তা জীন্‌স ও লিটলটনের প্রচলিত মতবাদের মূলে এসে কঠোর আঘাত ক'রে তাদের আজ ধূলিসাৎ করতে উদ্যত হয়েছে।